এপারে দিগন্ত
ওপারে অথৈ

সাইদ হোসেন

এপারে দিগন্ত

ওপারে অথৈ

*

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০০৯

Date of first edition publication: March, 2009

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Sayed Hossain (writer)

Contact Address:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya,
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-8-9

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Epare Diginto Opare Othoi, A bengali novel written by Sayed Hossain.

।। ১ ।।

পাতলা খান লেন

ঝির ঝির করে শিশির পড়ছে পাতলা খান লেনে । সকাল হতে আর বাকি নেই । কিছুক্ষণের মধ্যে মসজিদে আজান দেবে তারপর দেখা যাবে মুসুল্লিরা এগুচ্ছে মসজিদের দিকে । পাতলা খান লেনের শেষ মাথায় মসজিদ । গেল বছর দোতলা করা হয়েছে । পাড়ার লোকদের কাছে চাঁদা তুলে দোতলার ছাদ ঢালাই হলো । আমার কাছে মসজিদ কমিটির লোকজন এসে হাজির ।

বাবু, তুমি কিছু দেবে নাকি ? তাহলে আমরা দোতলাটা তুলতাম ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

এই নিন আমার চাঁদা, এই বলে দুই হাজার টাকা তুলে দিলাম ।

মনু মিয়া বললো, সবাই মিলে চাঁদা দিলে একদিন মসজিদটা দাঁড়িয়ে যাবে । আস না একদিন আমাদের মিটিংয়ে?

ঠিক আছে যাব । কবে যেন মিটিংটা ?

সামনের শুক্রবার আছরের পর ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

পাতলা খান লেনের আরেক মাথায় পাতলা খান ক্লাব । এপাড়া-ওপাড়া ফুটবল খেলে বেড়ায় ওরা । প্রায় সব খেলাতেই হারে তারপরেও উদ্যমের শেষ নেই ওদের । এই যে ওদের এতো উদ্যম, এত উৎসাহ সেটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে । একদিন ক্লাবের সভাপতি রবিন এলো । হালকা পাতলা ছেলে, বয়স বিশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় না ।

সালাম ..... বাবু ভাই ।

ওলাইকুম সালাম ।

খেলা আছে সামনে, এই বলে রবিন মাথা চুলকাতে লাগলো ।

আমি বললাম, কত লাগছে তোমাদের ?

সাদা দাত বের হয়ে এলো রবিনের তারপর মাথা নুয়ে বললো,

সব মিলিয়ে হাজার চারেক । আপনি এক হাজার দিলেই হবে । বাকীটা মুরুব্বিদের কাছে চেয়ে নেব ।

এবার কিন্তু জিততে হবে ?

সাদা দাতে রবিন হেসে দেয়, দোয়া করবেন । চেষ্টা তো করছি ।

আমি কিছু বলি না । টাকাটা ওর হাতে দেই ।

চা খাবে রবিন?

ধন্যবাদ বাবু ভাই । আপনারা কজন আছেন বলে ক্লাবটা এখনো টিকে আছে ।

ক্লাবের ঘর ভাড়া দিয়েছ?

রবিন আবারও হেসে দেয় ।

না । বিশ হাজার টাকা বকেয়া পড়েছে । ঘরের মালিক ভদ্রলোক বলে আমরা এখনো টিকে আছি ।

এখন কি করবে ঠিক করেছ?

রবিন অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, ভাবছি চ্যারিটি শো করবো, জুয়েল আইচকে নিয়ে আসবো । সেখান থেকে যদি কিছু টাকা তুলতে পারি ।

পুরোনো ঢাকার মাঝে এই পাতলা খান লেন । সেন্ট গ্রেগরী স্কুল পেরিয়ে ডানে মোড় নিলেই পাতলা খান লেন । সরু গলি, পনের ফিটের বেশি চওড়া হবে না । সেই গলি দিয়ে নিরন্তর রিকশা, গাড়ি এগুচ্ছে । রাস্তার স্বল্পতার জন্য প্রায় জ্যাম লেগে যায় । তখন অনেক ভলেন্টিয়ার নেমে আসে রাস্তায় । ওরাই হাকডাক করে রাস্তা সচল করে ফেলে ।

এই পাতলা খান লেনে আমাদের এক তালা বাড়ি । যেমনি লম্বা তেমনি পাশে বড় । আমার দাদা হাজি শরীয়তুল্লাহ সাহেব এই বাড়িটি করেছিলেন ১৯৫৪ সালে । এই ১৯৫৪ সাল কথাটি বাড়ির সামনে বড় করে খোদাই করা আছে । অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে লেখাটা । রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে বাড়িটা বানানো । ছয়-সাতটা সিমেন্টের ধাপ পেরিয়ে বাড়িতে উঠতে হয় । সব মিলিয়ে দশটি কক্ষ আছে এই বাড়িতে । এর মধ্যে পাঁচটা সব সময় বন্ধ থাকে, কেউ এলে খুলে দেয়া হয় । বাকি পাঁচটা আমরা ব্যবহার করি । আমাদের বাড়ি দেখলে যে কেউ বলবে এই বাড়ির লোকদের একদিন অনেক জৌলুস ছিল, ছিল অনেক নাম । কিন্তু কালের গর্ভে সে সব হারিয়ে গেছে । এখন শুধু মিট মিট করে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষয়ে যাওয়া বাড়িটা ।

।। ২ ।।

আমাদের বাবা

দোকানে বসে ঝিমাচ্ছি সেই সকাল থেকে । কাল রাতে একদম ঘুম হয় নি । মাঝে মাঝে ঘুম হয় না, রাতভরা বসে থাকি । এপাশ ওপাশ করি তারপর শেষ রাতের দিকে শুতে যাই । যেদিন রাতে ঘুম হয় না, তার পরের দিন খুব খারাপ লাগে । কেমন জানি অসারতায় হাত-পা ভেঙে আসে । মনে হয় রক্ত ভেঙে পানি হয়ে গেছে ।

যেদিন রাতে ঘুম হয় না, সেদিন উঠতে বেলা । ঘুম ভেঙে দেখি সুয্যি মামা চাঙে উঠে বসে আছে । আমার দাদার আমলে কেনা মস্ত ঘড়িতে সকাল দশটার ঘন্টি পড়ে । ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি ঘড়িটা । সোনালি প্লেটে মোড়ানো, বয়েস চল্লিশের নিচে না । আমার দাদা কলিকাতা থেকে এনেছিলেন ঘড়িটা । মাঝে দুবার নষ্ট হয়েছিল, বাবা গিয়ে সারিয়ে এনেছে ।

দোকানদার হেসে বললো, এ ঘড়ির পার্টস পাওয়া যায় না খন্দকার সাহেব । আমি সারাতে পারছি না ।
বাবা মন খারাপ করে বলে, আর কি কোন উপায় নেই ?
একটু থেমে দোকানদার বলে, কোলকাতায় গেলে হয়ত পারবেন ।

আস্ত এই ঘড়িটা মস্ত বড় সুটকেসে ভরে বাবা কলিকাতায় গেলেন তারপর সাত দিন পরে ফিরে এলেন । সাথে মস্ত ঘড়িটা ।
বাবু দেখলি কেমন সারিয়ে আনলাম ?
আমি হেসে বললাম, সত্যিই তুমি বাহাদুর ।
বাবা হেসে দেয় । তারপর বলে, তোর দাদার হাতের কেনা । সারা দেশ ঘুরলে এর জোড়া পাবি না ।
আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । কিছু বললাম না ।

সত্যি কথাটাই বললো বাবা । এ রকম বেধরক সাইজের ঘড়ি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না । যেমন ভারি তেমনি চওড়া । এইটে টানাটানি করতে অনেক কসরত করতে হয়, তারপরেও আমার বাবা তার আভিজাত্য ধরে রাখতে চান । আমার দাদার জমিদারী চিন্থকে আকড়ে ধরে শান্তি পান আমার বাবা ।

আমার দাদার মস্ত বড় জমিদারি ছিল মুন্সিগন্জে । আশেপাশের দুই তিন গাঁর প্রায় সব জমিই দাদার । জমি-জমা এত বেশি ছিল যে হেঁটে দেখা যেত না । ঘোড়ায় চড়ে তদারকি করতে হতো । আমার দাদা সাঙ-পাঙ নিয়ে জমি দেখতে বের হতেন । সাথে থাকতো আমার বাবা আর তার একমাত্র ভাই জীবন খন্দকার ।

একদিন দাদা মারা গেলেন । দাদার বিশাল সম্পত্তি এসে পড়লো আমার বাব-চাচার হাতে কিন্তু বাব-চাচারা সংসার-বিমুখ, কর্মবিমুখ । শুয়ে বসে ফরমায়েস করাটাই ওদের পছন্দ । ওরা বসে বসে খেতে লাগলো দাদার সম্পত্তি । প্রথমে একটি জমি বিক্রি করে, সেই টাকা দিয়ে কিছুদিন চলে তারপর টাকার দরকার পড়লে আরো একটা বিক্রি করে । এভাবে একে একে দাদার সব সম্পত্তি বিক্রি করে ফেললো ওরা । এখন শেষ সম্বল বলতে মুন্সিগন্জে দাদার বাড়ি, দুই একটা দোকান আর পাতলা খান লেনের এই বাড়িটা । আমাদের তিন ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে বাবা বিক্রি করেননি বাড়িটা ।

ISBN No. 978-983-43934-8-9

।। ৩ ।।

সকাল

একদম ঘুম আসতে চাইছে না । ঘড়ির কাটা রাত তিনটে ছুয়েছে । আজকাল ঘুম না হওয়াটা এক রকম রুটিনে দাঁড়িয়ে গেছে । কেন জানি প্রায়ই এরকম হয় ।

আমার রুমের পাশ দিয়ে বারান্দা চলে গেছে । সেই বারান্দার শেষ মাথায় রান্না ঘর । ওখানে গিয়ে গরম পানি চাপিয়ে দিয়েছি । টগবগ করে পানি ফুটতে শুরু করলো ।
কি রে বুবা, চা খাবি ?

তাকিয়ে দেখি আমার ছোট বোন আনু । এবার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে । কেমিষট্রিতে অনার্স । আমার চেয়ে বছর চারেক ছোট হবে । আমাকে বাবু না বলে বুবা ডাকে আদর করে । আমার আরো একটা বোন আছে, নাম রানু । সেও বুবা ডাকে । শুধু বাবা-মা আমার নাম পাল্টায়নি । ওদের কাছে আমি বাবু ।
আমি বললাম, হু খাচ্ছি । তোর লাগবে নাকি ?
ঠিক আছে । তোর সাথে এক কাপ খাই ।
আমি আরো কিছু পানি চায়ের কেতলিতে ঢেলে দিলাম ।
আনু বললো, তোকে দেখি আজকাল রাত-বিরেতে এঘর-ওঘর ঘুরে বেরাস । ব্যাপার কি ?
আমি বললাম, ঠিক বুঝতে পারছি না । ঘুম আসে না ।
বিকেলে হেঁটে আসবি প্রতিদিন । দেখবি কেমন ঘুম চলে আসছে ।
আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম,

আজ দুই মাইল হেঁটেছি । আরমানিটোলা পর্যন্ত গিয়েছি হেঁটে তারপর ফিরেছিও হেঁটে ।

আনু চুপ হয়ে গেল । তারপর বললো,

বাবা যে উঠোনে মাটি ফেলে ঢিবি করেছে, সেইটে কোদাল দিয়ে সমান কর । দেখবি দর-দর করে ঘাম ঝরছে । মাটি কাটার মতন কায়িক শ্রম একটিও নেই । দেখবি কেমন ঘুম চলে আসছে ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ করে গেলাম ।

কথা বলছিস না যে ? নিশ্চয় বাবার মতন বলবি না জমিদারের ছেলেকে মাটি কাটতে নেই ।

আনুর কথাটাই সত্যি । নিজের হাতে কোন কাজ করতে আমার আব্বা-চাচারা খুবই অসম্মান বোধ করেন । ওদের মনে হয় এই বুঝি সম্মাণ চলে গেলো, এই বুঝি ছোট হয়ে গেলাম কিন্তু এখন যে জমিদারি নেই বা পৃথীবি যে অন্য ধারায় বইছে, সে হিসেব ওদের নেই । বাবা সারাদিন ঘরে বসে থাকে । পাড়ার লোকদের সাথে মিশতে সংকোচ বোধ করে । কেউ যদি অসম্মাণ সূচক কথা বলে, তখন কি হবে ? আমরা তিন ভাই বোন কিন্তু সে গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসেছি । পাড়ার লোকদের সাথে মিশতে পছন্দ করি । আমাদের মা যতদিন আমাদের সাথে ছিলেন, ততদিন কিভাবে মানুষের সাথে মিশতে হয়, কিভাবে মানুষের সাথে কথা বলতে হয়, সে শিক্ষা দিয়ে গেছেন । পাড়ার মেয়েরা মার কাছে আসতো নানা সমস্যা নিয়ে । ওদেরকে সাহায্য করতো আমাদের মা ।

আমি বললাম,

শারীরিক পরিশ্রমের সাথে ঘুমের কোন সম্পর্ক নেই । ঘুম হলো একটা মানসিক ব্যাপার ।

আনু হেসে বললো, দুই একদিন মাটি কেটেই দেখ, তারপর ঘুম না এলে আমাকে বলিস ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

আনু বললো, বাবার রুমে উকি দিয়ে দেখিস । বাবাও রাতে ঘুমায় না, রাত ভর পায়চারি করে দরজা আটকিয়ে ।

সেজন্যই কি বাবা অনেক দেরিতে উঠে ?

ঠিক তাই, এই বলে আনু হেসে দিলো ।

তুই আর বাবা একি পদের । সারারাত বসে থাকিস আর ভোররাতে ঘুমুতে যাস ।

আমি কিছু বললাম না । বসে বসে চা খেতে লাগলাম ।

আনু আর রানু । ওরা আমার দুই বোন । রানু এখন কলেজে পড়ে, আগামী বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবে । আনুর মতন রানুও পড়াশোনায় সিরিয়াস । ক্লাস এইটে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি পেয়েছে । বাইওকেমিষ্ট্রি পড়বে রানু আর তার জন্য এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে ওর । আমি হয়েছি উল্টোটা । স্কুল-কলেজের পড়া কখনো আমার ভাল লাগেনি, কেমন যেন একঘেয়েমি লাগে । ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এ্যাডমিশন টেষ্টের দিন সকালে উঠে দেখি শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে কারণ এর আগের দিন অনেক রাতে ঘুমিয়েছি ।

বাবা এসে বললেন, বাবু আজ না তোর ভর্তি পরীক্ষা?

হু কিন্তু শরীরটা ভাল লাগছে না । কি করি বলো তো?

বাবা বললেন, কি করতে চাস?

আমি বললাম, আজ আর বের হই না, কি বলো?

বাবা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন তারপর বললেন, তাহলে কি পড়বি ?

আমি বললাম, কবি নজরুল কলেজে বিএ পড়বো ।

বাবা কিছু বললেন না । নিজের ঘরে চলে গেলেন ।

বাবার মতন আমারও অনেক অলসতা আছে । খামখেয়ালি করে এ্যাডমিশন টেষ্টটা দিলাম না । পড়া হলো না আমার ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু সে জন্য যে কোন আফসোস বা অনুশোচনা, তা বোধ হলো না । এখানে বাবার সাথে আমার অনেক মিল । আমরা দুজনের কেউ Ambitous না । বাবার জিনের ধারা আমাকে গিলে গিলে খেতে লাগলো ।

আনু-রানু আমার চেয়ে অনেক ছোট তারপরেও আমার সাথে গলায় গলায় ভাব । এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে আনু-রানু আমাকে সব বলে । পাড়ার ছেলেরা প্রায় রানু কে চিঠি দেয় । রানু আমাকে দেখায় সে সব ।

দেখেছো কি লিখেছে ?

কি লিখেছে ?

রানু চিঠিটা বাড়িয়ে দিল ।

চিঠিতে একটি ছবি আঁকা । আঁকা দেখেই বোঝা গেল কাঁচা হাতের কাজ । একটা ছেলে একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আছে । মেয়েটার গায়ে লেখা রানু আর ছেলেটার গায়ে পরাগ । নিচে লিখেছে, আমি পরাগ । যদি ফোন করো তো খুশি হব । নিচে ছোট্ট করে মোবাইল নম্বর দেয়া ।

রানু বললো, এখন কি করবো ?

আমি হেসে বললাম, কিছু করতে হবে না । কালেকশনে রেখে দে । বড় হলে নাতি পুতিদের দেখাস ।

রানুর পছন্দ হলো কথাটা ।

ঠিক আছে এখনি রেখে দিচ্ছি, এই বলে রানু চলে গেল ।

আমার একটা চিঠির বাক্স আছে । ছেলেবেলা থেকে যত চিঠি পেয়েছি, সে সব বন্দি করে রেখেছি ঐ বাক্সে । মাঝে মাঝে খুলে বসি সে সব । আমার এক cousin থাকতো ময়মনসিংহে । সে প্রায়ই চিঠি পাঠাতো । তখন আমি স্কুলে পড়ি । একবার ও লিখলো, এখন আমের মৌসুম চলছে বাংলাদেশে । ময়মনসিংহের রাস্তাঘাট, বাজার-সদর সব ভরে গেছে আম দিয়ে কিন্তু সমস্যা হলো আম খেলে দাতের ফাঁকে আঁশ গিয়ে বিঁধে, তখন আর ছাড়ানো যায় না । কিন্তু তোর তো সে সমস্যা নেই কারণ তোর দাঁত ফাঁকফাঁক । টপাটপ খেয়ে যেতে পারিস । ময়মনসিংহে চলে আয় । আম খাওয়ার দাওয়াত দিলাম ।

ইতি অলি ।

আবার নিচে ছোট্ট করে লিখেছে :

NB. একতা এক্সপ্রেস ভোর আটটায় ছেড়ে যায় ঢাকা থেকে । তিন ঘন্টায় ময়মনসিংহে পৌঁছে । কবে আসছিস?

।। ৪ ।।

আশেক

অনেক আগে থেকেই আনুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে । ছেলের নাম আশেক । আশেকের দাদারাও জমিদার ছিল । সেই সূত্র ধরে আমার দাদার সাথে আশেকের দাদার পরিচয় । দুই পরিবারের মধ্যে সে কথা এখনো স্থির আছে । আশেক পাশ করে বেরুলে ওদের বিয়ে হবে ।

সালাম ভাই । কেমন আছেন? এই বলে আশেক উঠে দাঁড়িয়েছে ।

বসার ঘরে ঢুকে দেখি আশেক ।

আমি বললাম, কখন এলে?

এইতো কিছুক্ষণ ।

তারপর বলো কেমন আছ?

ভাল ।

চাচার শরীর কেমন ?

বাবা ভাল আছেন ।

তোমার পড়াশুনা?

এই তো চলে যাচ্ছে ।

তারপর তোমার লেখালেখি ? ছড়া লিখছো তো ?

মাঝে মাঝে লিখি । ছোটদের ছড়া লিখতে বেশি পছন্দ করি ।

আর কি লেখ?

ছড়াই লিখি । মাঝে মাঝে রহস্য গল্প লিখি দুই একটা ।

আমি বললাম, আনুর কাছে তোমার ছড়া দেখেছি । চেষ্টা করলে আরো ভাল লিখতে পারবে ।

একদন সময় পাই না বাবু ভাই । প্রতি সপ্তাহে পরীক্ষা থাকে । বুয়েটের পড়া তৈরি করে আর সময় থাকে না ।

আমি বললাম, বুয়েটের ছাত্রদের সময়ের খুব অভাব তারপরেও বুয়েটে পড়ছো, সেটা কম কি?

আশেক হেসে দিল । খুশির হাসি ।

আমি বললাম, সব মিলিয়ে কটা ছড়া লিখলে?

একটু সময় নিয়ে আশেক বললো, একশোর কাছাকাছি । এর মধ্যে অর্ধেক ভাল হয়নি । পঁচিশ-ত্রিশটা মোটামুটি হয়েছে ।

একদিন নিয়ে আস তোমার ছড়ার খাতাটা । দূজন মিলে দেখবো ।

আশেক খুশি হয়ে গেল । বললো, তাহলে তো খুব ভাল হয় । আপনি কিছু কমেন্টস দিলে আরো ভাল লিখতে পারবো ।

আমি হেসে বললাম, কমেন্টস দেবার লোক আমি নই । দুজন মিলে দেখবো, এই আর কি । কবে আসছো ?

যদি বলেন তো সামনের শনিবার আসি । ওদিন তো সরকারি ছুটি ।

আমি বললাম,

ঠিক আছে । তোমাকে খিচুরির দাওয়াত দিলাম । সবাই মিলে খিচুরি খাব তারপর তোমার ছড়া নিয়ে বসবো । সুযোগ পেলে ছোটখাট ছড়ার অনুষ্ঠানও করা যেতে পারে ।

আশেক হেসে দিল । বুঝলাম আমার কথায় ও খুশি হয়েছে ।

আশেকের দাদা মারা গেলে বিশাল সম্পত্তি আশেকের বাবার হাতে এসে পড়ে কিন্তু আশেকের বাবা বসে বসে খাননি সেসব । তিনি সেই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কয়েকগুন বাড়িয়েছে । ঢাকা শহরে বড় বড় ব্যবসা ওদের হাতে । আশেকের বাবা নিজে লেখাপড়া শিখেছেন, ছেলেমেয়েদেরকে ভাল জায়গায় পড়িয়েছেন ফলে আমাদের মতন আশেকদের জীবনে জমিদারি নিভে যায় নি ।

আমি বললাম, চা টা কিছু খেয়েছ?

এই তো এলাম ভাইয়া । নিশ্চয় খাবো ।

তুমি বস, এই বলে আমি ভেতরে চলে এলাম ।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখি আনু চা বানাচ্ছে ?

আমি বললাম, আমাকে এক কাপ দিস ।

ঠিক আছে, এই বলে আনু চা বানাতে লাগল । বুঝলাম ওর সময় নেই এখন আমার সাথে কথা বলবার ।

এই নাও তোমার চা, আনু চা বাড়িয়ে দিল ।

আশেক হাত বাড়িয়ে চা নিল । তারপর বললো, একেবারে ডুব মেরেছ, ব্যাপার কি?

আনু বললো, পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে । ক্লাস করে বাসায় এসে পড়তে বসি । প্রতিটা টেষ্টের মার্ক যোগ হয় ফাইনালে ।

তোমাকে মাফ করে দিলাম, এই বলে আশেক হেসে দিল ।

আনু বললো, তোমার খবর কি?

এই তো চলে যাচ্ছে । ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করে আসি ।

তোমার প্রকান্ড গাড়িটা আমাদের গলিতে ঢুকলো ?

আশেক হেসে বললো, না ঢুকলেও ঢোকাতে হবে কারণ এখানেই যে আমার ঠিকানা ।

এ সব বাংলা সিনেমার ডায়ালগ কই পেলে ?

আশেক হেসে বললো, গতকাল দেখেছি বাংলা সিনেমা । সেখান থেকে বললাম ।

আর কি কি ডায়ালগ আছে ?

শুনবে ?

প্লিজ বলো, এই বলে আনু উৎসাহে তাকালো আশেকের দিকে ।

শুধু মাত্র তোমাকে দেখতেই আমার আসা । হয় আমাকে নাও, নয় আমার সব কিছু ।

আনু হেসে দিল তারপর বললো, আরো একটা বলো ।

আশেক কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, আর মনে নেই ।

আনু বললো, আমাকে দিও তো সিনেমাটা । কতদিন বাংলা সিনেমা দেখি না ।

ঠিক আছে । কাল তোমাকে ডিপার্টমেন্টে পৌছে দেব ।

আনু বললো, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছ আশেক । ব্যাপার কি?

কোন ব্যাপার নেই । এমনি শুকাচ্ছি ।

কোন অসুখ-বিসুখ?

কৈ না তো ।

আনু বললো, সিগারেট খেও না প্লিজ । তুমি তো ভাল করেই জান ।

ছেড়ে দেব । আরো তিন মাস সময় দাও ।

এভাবে তো অনেকবার সময় নিলে ?

এবারই শেষ ।

আনু হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আশেক বললো, কোন খোঁজ পেলে সুইজারল্যান্ড থেকে ?

হু । লুসান ইউনিভার্সিটি ভর্তির কাগজ পত্র পাঠিয়েছে । অনার্সে ফাষ্ট ক্লাস থাকলে ওরা স্কলারশিপ দেবে ।

তোমার তো এখনো দুই বছর বাকি পাশ করতে ?

হু বলে সায় দিল আনু তারপর বললো, দেখবে কেমন হাতের ফাঁক গলিয়ে দুই বছর পার হয়ে যাবে । তোমার এ্যাডমিশন?

আশেক বললো,

জেনেভা থেকে ভর্তির ফরম এসেছে । আর তো এক বছর বুয়েটে পাশ করতে । এখন থেকে তোড়জোড় শুরু করেছি । প্রথমে আমি যাব তারপর তুমি ।

আনু খুশি হয়ে গেল । কিছু বললো না ।

আশেক আর আনুর পড়াশোনার কোন শেষ নেই । সারাদিন ভর ওরা শুধু পড়ে । আশেকের মাথা খুব ভাল । একটু পড়লেই ধাই ধাই করে মার্ক উঠে আসে । বুয়েট পাশ করে আশেক সুইজারল্যান্ডে যাবে মাস্টার্স করতে তারপর ওদের বিয়ের কথা আছে । ওরা অনেক বড় হতে চায় । আমার আর বাবার মতন ঘরে বসে থাকতে অপছন্দ করে ওরা ।

।। ৫ ।।

আমাদের মা

আনু-রানু আর আমার মা হাসিনা বানু । বাবা যখন মাকে বিয়ে করে আনেন, তখন মার বয়স ষোল । ক্লাস এইটে পড়তো মা । আরো পড়তে চেয়েছিলেন আমাদের মা কিন্তু পরিবারের চাপে তা হয়নি । মা'রা দুই ভাই । কোন বোন নেই ওদের । মামারা ব্যবসা করে চিটাগাংয়ে, বাব-দাদার ব্যবসা । আমার নানা মস্ত বড় ব্যবসা রেখে গেছেন ।

মা'র বিয়ে হয় জমিদার বাড়িতে কিন্তু সেখানে মা কখনো সূখি হননি । মার শ্বশুড়-শাশুড়ি মা'কে খুব ভালবাসতো কিন্তু বাধ সাধলো তার স্বামী । বাবার সাথে মার কখনো বনিবনা হয়নি । ওদের মধ্যে সব সময় দূরত্ব থাকতো কিন্তু দূরত্বটা ঠিক কি নিয়ে, তা কখনো জানা যায়নি । ওরা খুব চাপা স্বভাবের তাই সব কিছু অজানাই থেকে গেছে ।

আমরা প্রকাশ্যে কখনো বাবা মা'কে ঝগড়া করতে দেখিনি কিন্তু তলে তলে যে উত্তেজনা চলছে, সেটা আঁচ করতে পারতাম । মা চলে যেতেন বাপের বাড়িতে তারপর মাসের পর মাস আসতেন না । আমার বাবাও যে গিয়ে নিয়ে আসবে, তাও সে করতো না । সংসার বিরাগি আমার বাবা নিরবে নিভৃতে একাকি সময় কাটাতেন পাতলা খান লেনের বাসায় ।

মাঝে মাঝে বাবা চলে যেতেন মুন্সিগন্জে তারপর জীবন চাচার সাথে কদিন কাটিয়ে ফিরে আসতেন ।

আমাদের মা হাতের কাজ খুব ভাল জানতেন । সুন্দর সুন্দর জামা বানাতেন হাত দিয়ে তারপর দোকানে পাঠাতো । বাবা এসব পছন্দ করতো না । জমিদার বাড়ির বউরা জামা বিক্রি করবে এ কেমন কথা ? আমার মা সখ হিসেবে নিয়েছিলেন ব্যাপারটা কিন্তু বাবাকে বোঝানো যায় নি সে কথা ।

আমাদের বাড়িতে দুই বীপরিত স্রোতধারা কাজ করছে সব সময় । আব্বা-চাচা আর আমি যতখানি সম্ভব ঝামেলা ঝক্কি এরিয়ে জীবন পার করতে পছন্দ করি কিন্তু আনু-রানুরা উল্টো । ওরা মায়ের উদ্যমী স্বভাব পেয়েছে । কিভাবে আরো পড়াশোনা করবে, কিভাবে আরো ভাল কিছু করবে, সে নিয়ে ওদের প্ল্যান-প্রোগামের শেষ নেই ।

আমাদের মা আমাদের সাথে থাকেন না কিন্তু সব সময় ফোনে যোগাযোগ রাখেন । আমাদের কথা মনে হলে দৌড়ে আসেন তারপর বাবার সাথে না পেরে আবার ফিরে যান নিজের বাড়িতে ।
মা একবার ফোন করে বললো, আনু-রানুকে নিয়ে একবার ঘুরে যা । কতদিন ওদের দেখি না ।
আমি বললাম, সামনের শীতে আসছি । আমরা পতেঙা দেখবো ।
মা বললেন, ঠিক আছে । শীতের জামাকাপড় বেশি করে আনিস ।

যা বলা তাই করা । ডিসেম্বর পড়তেই আমরা নানার বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম । মেহেদিবাগে নানার বাসা, একবার চিটাগাং মেডিকেল কলেজ লাগোয়া । চারতলা বাড়ি করেছে নানা । সেই বাড়ির দোতলায় মা থাকেন । দুই মামা অন্য সব ফ্ল্যাটে । মা কে ওরা খুব ভালবাসে তাই মার কোন অসুবিধে হয় না ।

তখন শীত পড়তে শুরু করেছে । চিটাগাং শহরের রাস্তাঘাট শীতে কুকড়ে আছে । পাহাড়ি ঢালে শিশির পড়ে থাকে, তারপর বেলা উঠলে ওগুলো মিলিয়ে যায় । আবার শিশির পড়তে শুরু করে বিকেলের পর থেকে । রাতভর শিশির পড়ে, সেই শিশিরে পাহাড়ি রাস্তা, বাড়ির আঙিনা, পাহাড়ি ঢাল চুপসে যায় ।

মা বললেন, আনু-রানু তোমরা কি খাবে ?
আনু বললো, তোমার হাতের পুটি মাছ ।
মা হেসে বললেন, ঠিক আছে, পুটি আনাচ্ছি, এই বলে লোক পাঠিয়ে দিলেন বাজারে ।
বাবু তুই?
পুটি ।
তোরও পুঁটি ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

রানু এসে বললো, মা, আমরা কবে পতেঙা যাচ্ছি ?

পরশু । তোমাদের মামা নিয়ে যাবে ওর গাড়িতে ।

আমরা খুশি হয়ে গেলাম ।

মামা আমদের পতেঙায় অনেক ঘুরালেন । সারাদিন আমরা কাটালাম পতেঙার পাড়ে । বারে বারে সাগরে ঢেউ এসে আছরে পড়ছিল আমাদের পায়ের কাছে । আনু-রানু ঘর বানাতে বসে গেল সাগরের পাড়ে ।

আমি বললাম, আশেকটা থাকলে ভাল হতো । ওকে নিয়ে হাঁটা যেত সাগরের পাড় ঘেষে ।

আনু বললো, আশেকে আসতে চাচ্ছিল কিন্তু আমি মানা করেছি । মামারা আবার কি মনে করে?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । তারপর বললাম, আমরা সোনার গাঁ দেখতে যাব আশেককে নিয়ে । আমি, তুই, রানু আর আশেক । ওর ছড়ার বইটা তোর কাছে ?

আনু মাথা নেড়ে না বললো ।

আমি বললাম,

দুই তিনটে ছড়া পড়েছি, বেশ সুন্দর । চাইলে লিখতে পাড়বে ছেলেটা । ওর বানরের কান্ড ছড়াটা সবচেয়ে সুন্দর ।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে আনু বললো,

না । সবচেয়ে সুন্দর গতকালের বিকেল ছড়াটা কারণ এই ছড়ায় একটা মিনিং আছে ।

আমি কিছু বললাম না । বোনদের সাথে আমি কদাচিত তর্ক করি । ওরা যা বলে মন দিয়ে শুনি তারপর নিজে যেটা ভাল মনে করি সেটা করে ফেলি ।

আমি বললাম, আশেকের পড়াশোনার খবর কি ?

ওকে বলতে হয় না, বুবা । নিজ থেকে সব পড়া তৈরি করে পরীক্ষা হলে যায় ।

আমি কিছু বললাম না ।

কিছুক্ষণ পরে আনু বললো, আশেক এর মানে কি বুবা ?

আশেক মানে খুদা প্রেমিক ।

খুদার আবার প্রেমিক আছে নাকি? উনি তো সকলের প্রভু ।

আমি একটু থেমে বললাম,

আসলে ব্যাপারটা উল্টো । মানুষের কোন প্রেমিক নেই । যখন স্বার্থের সংঘাত ঘটে, তখন প্রেম ঝুলে পড়ে । খান খান শব্দে ভেঙে যায় সব কিছু কিন্তু খুদার প্রেমে কোন স্বার্থ নেই, এর স্থায়ীত্ব আছে । একবার জড়িয়ে গেলে আর বেরিয়ে আসা যায় না ।

আনু বললো, তুই কি মিষ্টির দোকান তুলে দিয়ে আশেক হবি ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, হতে পারলে খারাপ হতো না কিন্তু এ পথ অনেক কষ্টের । আমার মতন আয়েষি মানুষ এ সব পারবে না ।

আনু কিছু বললো না । চুপ করে গেল ।

।। ৬ ।।

হাজি শরীয়তুল্লাহ মিষ্টান্ন ভান্ডার

পাতলা খান লেনের শেষ মাথায় আমার দাদা মিষ্টির দোকান খুলেছিলেন, হাজী শরীয়তুল্লাহ মিষ্টান্ন ভান্ডার । নিজের নামেই খুলেছিলেন । সেই থেকে দোকানটা আছে । দাদার সময়ে দোকানের সুনাম ছিল । দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতো মিষ্টি নিতে । দাদা মারা যাবার পর আব্বা-চাচার হাতে দোকান চলে আসে, ফলে যা হবার হলো । মিষ্টির মান পড়তে লাগলো কারণ আব্বা-চাচারা কখনো দোকানে এসে বসেন না । ওরা ঘরে বসে ফাই-ফরমায়েশ করে সময় কাটায় ।

আমি বড় হয়ে দোকানের হাল ধরি কিন্তু ততদিনে দোকানের সুনাম পড়ে গেছে । লোকজন আর আসে না এদিকে তারপরেও চেষ্টা করতে লাগলাম হারানো সুনাম ফিরে পেতে কিন্তু সমস্যা বাঁধালো নূতন শহরে গজিয়ে উঠা মিষ্টির দোকানগুলো । ওরা এত স্বাদের মিষ্টি বানাতে লাগলো যে ওদের সাথে পেড়ে উঠা দায় হলো । তারপরেও মিট মিট করে দোকান চালিয়ে নিচ্ছি আমি ।

এই যে বাবু ভাই?
তাকিয়ে দেখি ঈশা দাঁড়িয়ে আছে । সারা মুখে হাসি ।
হ্যাঁ বলো ।
সাদা মিষ্টি আছে?
আছে । কত কেজি লাগবে ?
চার কেজি দিন ।
আর কিছু?
আজকে এটুকুই ।
মিষ্টি কেন? আমি হেসে বললাম ।
কলির জন্মদিন । ওর বন্ধুরা আসবে ।

ঈশারা আমাদের পাড়াতেই থাকে । আমার চেয়ে বছর তিনেক ছোট হবে, আনুদের সমান । ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সেকেন্ড ইয়ারে । আনুর মতন সারাদিন পড়াশুনা করে । পাতলা খানের মাথায় ঈশাদের বাড়ি । ওদের দুইটা ফার্মেসী আছে আরমানিটোলাতে, সেই টাকায় মস্ত বড় বাড়ি তুলেছে ঈশার বাবা । ছেলেবেলায় অনেক খেলেছি এক সাথে । একবার ঈশাকে পিঠে ঘুষি মেরেছিলাম ফলে ওর পিঠের হাড্ডি সরে যায় । পরে হাসপাতালে ভর্তি করে সেটা সোজা করতে হয়েছে । এরপরে ঈশাদের বাসায় অনেক দিন যাইনি ভয়ে তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে । মার মুখে শুনেছি ছেলেবেলায় আমি খুব দূরন্ত ছিলাম । একটু বড় হতেই শান্ত হয়ে গেছি ।

আমি বললাম, চাচা কেমন আছে, ঈশা ?

ভাল । আপনি?

এই তো চলে যাচ্ছে হাজি শরীয়তুল্লাহ মিষ্টি ভান্ডার নিয়ে ।

আপনার মিষ্টি কিন্তু এখনো চলে বিশেষত পুরোনো লোকেরা এখনো পছন্দ করে ।

আমি হেসে বললাম,

নূতন ঢাকায় এখন ভাল ভাল মিষ্টির দোকান হয়েছে, তাই এদিকে কেউ আসে না ।

ঈশা বলে উঠলো, আমার ভাল লাগে সাদা মিষ্টিটা । এইটে আপনাদের মতন কেউ বানাতে পারে না ।

সত্যি বলছো?

তিন সত্যি, এই বলে ঈশা হেসে দিল ।

আমরা মিষ্টি দোকানের এক কোনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি । ঈশা আজ কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পড়েছে । বরারবরি ও শাড়ি পড়তে পছন্দ করে । কালো পাড়ের সাদা শাড়িতে ওকে খুব মানায়, খুব পবিত্র মনে হয় ঈশাকে ।

আমি বললাম, ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে কি করবে ঠিক করেছ?

পড়া তো শেষ করবো না, করতেই থাকবো ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম?

ঈশা হেসে বললো, বাংলাদেশের পড়া শেষ করে বিদেশ যাব পড়তে । তারপর ওখানকার পড়া শেষ হলে নিজে নিজে পড়বো জীবনভর ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

আনুর কথা মনে পড়লো আমার । আনুও তাই বলে । ওরা যে পড়াশোনা এতো ভালবাসে না শুনলে বিশ্বেস হবে না ।

ঈশা বললো, বাবু ভাই আপনি মিছিমিছি লেখাপড়াটা করলেন না, চাইলেই পারতেন ।

হু পারতাম কিন্তু অলসতার জন্য পারিনি ।

ঈশা খুশি হয়ে গেল আমার স্বীকারক্তি শুনে তারপর বললো, আবার শুরু করেন । বিএ তো পাশ করলেন, এবার এমএ টা দিয়ে দেন ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

ঈশা বললো, ছেলেবালায় আপনি আমাকে ঘুষি মেরেছিলেন । এখন নিজেকে ঘুষি মারুন যেন অলসতা কেটে যায় ।

আমি হেসে বললাম, আমি খুব খারাপ কাজ করেছিলাম ঈশা । তুমি আমাকে মাফ করে দিও ।

মাফ করতে পারি এক শর্তে ?

কি সেটা?

আপনাকে এমএ তে ভর্তি হতে হবে এবং পরীক্ষা দিতে হবে । সুযোগ থেকেও ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে না শুনলে কেমন অস্বস্তি লাগে ।

আমি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলাম তারপর বললাম, ঠিক আছে । তোমার কথাই রইলো । কাল গিয়ে ফরম নিয়ে আসবো ।

ঈশা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি বললাম,

তোমরা যেভাবে আদাজল খেয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, সেটা আমার ভেতর থেকে আসে না । কি করবো বলো?

ভেতর থেকে আসে ঠিকই কিন্তু আপনি সেটা সরিয়ে দেন ।

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, হয়তোবা ঠিকই বলছো । যাও মেনে নিলাম তোমার কথাটা ।

খুশি হয়ে গেল মেয়েটা । সে যে আমাকে বোঝাতে পেরেছে, সে জন্যই ও খুশি ।

আমি বললাম, তুমি আমাদের বেগম রোকেয়া সাখোয়াত হোসেন ।

ঈশা হেসে দিল তারপর বললো, এখন আমি যাই, বাসায় আসবেন ।

ঠিক আছে । চাচাকে ছালম দিও ।

নিজের পড়াশোনার ফাঁকেফাঁকে ঈশা সোসাল ওয়ার্ক করে । পাড়ায় যেসব মেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে, ঈশা তাদের পড়াশোনায় সাহায্য করে । অনেক গৃহীনি ভর্তি হয়েছে কলেজে ঈশার কারণে । কাছেই সরকারি কলেজ । ওখানে পড়ে ওরা ।

।। ৭ ।।

জীবন চাচা

বাবারা দুই ভাই তাই চাচা বলতে আমাদের এক চাচা । বাবার চেয়ে অনেক ছোট বয়েসে । আমার চেয়ে বছর পনের বড় হবে । আমার দাদী শখ করে লালু ডাকতেন । ভাল নাম জীবন খন্দকার । মুন্সিগন্জ হরগঙা কলেজে বিএ পড়েছে ইংরেজী সাহিত্যে । ভাল ইংরেজী জানে কিন্তু কখনো বলবে না । মাঝে মাঝে দেখি খাতে খুলে বসে, দুই এক লাইন ইংরেজী লেখে তারপর খাতা বন্ধ করে রাখে । এভাবে খাতাটা বন্ধ থাকে মাসের পর মাস তারপর মন চাইলে আবার দুই এক লাইন লেখে ।

বাবার মতনি চাচা । শুয়ে বসে ফরমায়েশ করাটাই জীবন চাচার কাজ । এই যে জমিদারি নেই, নেই কোন শানশাওকাত, তাই বলে অর্ডার-ফরমায়েশ করবার শেষ নেই ওদের । দাদার জমিদারি চলে গেছে সত্যি কিন্তু বিশ্বস্ত পুরোনো লোকগুলো এখনো থেকে গেছে ঐ বাড়িতে । ওরাই জীবন চাচার ফাই-রমায়েশ পালন করে অতি বিশ্বস্থতার সাথে । বংশ পরম্পরায় ওরা থাকছে এই বাড়িতে । এ বাড়ির সাথে মিশে আছে ওদের নাড়ীর টান ।

জীবন চাচা বিয়ে করেননি, একা একাই থাকেন । আমার বাব-চাচারা সংসারে উদাসীন । কিসে ওদের ভাল লাগা অথবা কিসে ওদের অনিহা সেটা বোঝবার যো নেই । ওরাই জানে ওরা কি চায় ।

আমি বললাম, চাচা বিয়ে করবে না?
করবো । একটু গুছিয়ে নেই ।
আর কবে গুছাবে ?
এই তো, এই বলে জীবন চাচা হেসে দেয় । চাচা হাসলে ওর নকল দাত বেরিয়ে আসে । নকল দাত টা আবার সোনার প্লেটে মোড়ানো, জমিদার বংশের বলে সোনা দিয়ে দাত বাধিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের দাদা ।

আমি বললাম,

আমাদের পাতলা খান লেনে একজন ভদ্রমহিলা থাকেন । তোমার কাছাকাছি বয়েস । বিয়ে করেননি, বাবা-মার সাথে থাকে । খুব ভাল আপাটা । তুমি চাইলে বিয়ে করতে পার ।

কেন বিয়ে করেননি ভদ্রমহিলা ? জীবন চাচা মাথা নাড়িয়ে জানতে চাইলেন ।

সে খবর আমার জানা নেই । দোকানে প্রায় আসে মিষ্টি নিতে ।

চাচা চুপ হয়ে গেল । কিছু বললো না ।

চাচাকে কেউ বিয়ের কথা বললে চাচা চুপ হয়ে যায় । অনেকক্ষণ গুম মেরে বসে থাকে । তারপর হেঁটে হেঁটে অন্য ঘরে চলে যায় ।

আমি বললাম, তুমি কি এখন হেঁটে হেঁটে অন্য ঘরে চলে যাবে ?

চাচা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, ভদ্রমহিলা কালো পাড়ের সাদা শাড়ী পড়েন, ঠিক?

ঠিক । কিভাবে জানলে ?

চাচা বললেন, তোর তো কালো পাড়ের সাদা শাড়ী সবচেয়ে পছন্দ । তুই যেহেতু পছন্দ করেছিস, এর মানে কালো পাড়ের সাদা শাড়ী ব্যাপারটা থাকছেই ।

তোমাকে একশোতে একশো দিলাম চাচা, এই বলে আমি হেসে দিলাম । তারপর বললাম, সত্যি করে বলোতো বিয়ে কেন করছো না?

একটু থেমে চাচা বললেন, একদম ভাল লাগে না ঘর-সংসার । একটা মেয়েকে ঘরে এনে বিপদে কেন ফেলি?

নাও তো হতে পারে ?

জীবন চাচা হেসে বললেন,

তোর বাবা না বুঝে বিয়ে করেছে । সে যে ঘর-সংসার পছন্দ করে না, সেটা বোঝবার আগেই তোদের দাদা ভাইয়ের বিয়ে দিল । এখন তোদের কি হাল? তোদের মা থেকেও নেই । সারা বছর বাপের বাড়ি পড়ে থাকে । তোর বাপ যে গিয়ে নিয়ে আসবে, তাও সে করে না ।

এই সব দোহাই দিয়ে বিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছ চাচা ?

তুই আসলেই গাধা । তোকে এতক্ষণ কি বললাম ?

জীবন চাচার মুখে গাধা শুনে অপমানিত বোধ করতে লাগলাম কিন্তু সেটা প্রকাশ করলাম না । আমরা যে এখন অনেক বড় হয়েছি, আমাদের সাথে যে কিছুটা হিসেব করে কথা বলতে হবে, সে দিকে চাচার খেয়াল নেই । এই তো গত মাসে, আনু যেন কি বললো, সাথে সাথে চাচা বললেন, তুই এখনো শিশুই রয়ে গেলি, তোর বুদ্ধি আক্কেল কখনো হবে না ? চাচা আমাদের যাই বলুক, চাচা আমাদের ভালবাসেন জান দিয়ে তাই চাচার কথায় আমরা পিছিয়ে আসি না ।

আমি বললাম, আমাকে গাধা বলো আর যাই বলো, তোমাকে ঐ আপাটার সাথে বিয়ে দেব ।
কালো পাড়ের সাদা শাড়ির আপা ?
হু, বলে আমি মাথা নাড়লাম ।
মাথায় চুল নেই এমন লোককে তোর আপা বিয়ে করবে?
হেসে বললাম, আমি বললে করবে কারণ আপা আমাকে খুব বিশ্বেস করে ।
তুই তো তাহলে আপার বিশ্বাস ভাঙছিস ?
আমি বললাম, সেটা কি রকম?

তুই আপার ঘারে এমন একজন চাপাবি যে কিনা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে । তোর মার মতন বার মাস বাপের বাড়ী কাটাতে হবে ।
আমি চুপ হয়ে গেলাম । চাচার কথাটা ভাবতে লাগলাম ।
কথা বলছিস না যে? চাচা তাড়া দিয়ে বললেন ।
ঠিক আছে । আমার প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিচ্ছি ।
চাচা হাসতে লাগলেন । প্রাণ ভরা হাসি ।

জীবন চাচার সবচেয়ে বড় হবি হলো পশু পাখি পালা । দাদার বাড়িটা প্রায় তিন বিঘে জমির উপর । সেই বাড়ির চারিপাশে ছোট ছোট ঘর করে পশু পাখি পালে জীবন চাচা । গরুর গোয়ালটা হলো সবচেয়ে বড় । দশ পনেরটা গরু আছে, ওরা নিয়মিত বাচ্চা দেয় । এদিকে ভেড়া-ছাগলের ঘর । কবুতর আছে ডজন খানেক । প্রতিদিন ওরা উড়ে এসে বসে । জীবন চাচা খুদ ছিটিয়ে দেয়, ওরা বসে বসে খায় । মাছের বড় বড় কুয়া করা হয়েছে । সেখানে মাছ ঘুরে বেরায় । আবার অনেক প্রজাতি মাছের জন্য বড় বড় একোরিয়াম বসানো আছে । লাল-নীল ডোরাকাটা মাছ ঘুরে বেড়ায় একোরিয়ামে ।

যখনি হাতে কিছু টাকা আসে, জীবন চাচা চলে আসে ঢাকায় তারপর নানা ধরণের পাখি, মাছ কিনতে থাকে । অতঃপর সেগুলোর স্থান হয় খামার বাড়িতে । এসব দেখাশোনার লোক আছে । এ বাড়ীরই পুরোনো লোক ওরা । ওরাই যত্ন নিয়ে দেখে ।

একদিন আনু এসে বললো, জীবন চাচা ফোন করেছে । নূতন পাখি এসেছে । আমাদের সবার দাওয়াত ।

আমি বললাম, কবে?

সামনের শুক্রবার ।

আমি বললাম, ঠিক আছে । অনেকদিন মুন্সিগন্জ যাই না । আশেককে বলবি ? আমাদের সাথে ঘুরে এলো ।

আশেক যাবে?

বলেই দেখ ।

আনু একটু চিন্তা করে বললো, ঠিক আছে । ফোন করে দেখি । তাহলে আমরা যাচ্ছি ?

হু । চাচাকে বলে দে ।

বাবা বিএ পাশ করেছে তাও অনেক বছর আগে । হরগঙা কলেজে বিএ পড়েছে বাবা । তখন মুন্সিগন্জের হরগঙা কলেজ খুব নামকরা, দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসতো পড়তে ।

বিএ পাশ করবার পর বাবা বললেন, আমি চাকরি করবো ।

তখন গ্রামের লোকজন বললো, আপনারা চাকরি করবেন, একি কথা ? আপনারা তো মানুষকে চাকরি দেবেন, চাকরি করবো আমরা । আপনি চাকরি করলে আপনার আব্বাজান হাজি শরীয়তুল্লাহ সাহেবের সম্মান কই থাকলো ?

বাবা কিছু বললো না, ভাবলেন সত্যি বুঝি তাই । সেই বুঝ বাবার এখনো আছে ।

আমি মিষ্টির দোকানে বসি সেটা বাবা চান না । একবার এসে বললো, বাবু, তুই বসিস না দোকানে । কালু মিয়াকে সব বুঝিয়ে দে, সেই চালাবে । তুই মাঝে সাঝে গিয়ে দেখিয়ে আসলি । এ সব দোকানে বসা ছোট মানুষের কাজ ।

আমি বললাম, ঠিক আছে ।

বাবা আর কিছু বললেন । নিজের ঘরে চলে গেলেন ।

আমি অবশ্য বাবার কথা পুরো মানি না । একবেলা হলেও দোকানে গিয়ে বসি । সত্যি কথা বলতে, এখন আমাদের সংসার চলে এই দোকানকে ঘিরে । মুন্সিগন্জ থেকে চাল-ডাল আসে । মাঝে-সাঝে জীবন চাচা এসে টাকা দিয়ে যায় ; সম্ভবত দোকান ভাড়ার টাকা ।

একবার চাচার খুব অসুখ হলো । আনু-রানুরা খবর পেয়ে চলে গেলো । আমি একদিন পরে গেলাম । চাচা বললেন, ভিজে ভিজে জ্বরে পড়েছি ।

আমি বললাম, ভাল হয়ে যাবে চাচা ।

চাচা বললেন,

আর যদি ভাল না হই, আমার কবর এখানে দিস না । আমার কবর দিস এমন জায়গায় যেখানে কেউ আমাকে খুঁজে না পায় । শুধু তুই, আনু-রানু ভাইজান আর ভাবী-সাহেবা জানবে ।

আমি বললাম, তুমি মরবে না । তোমাকে আমরা ধরে রাখবো শক্ত করে ।

জীবন চাচা বললেন, জানতে চাইলি না কেন এমন জায়গায় কবর চাচ্ছি যেন কেউ আমাকে খুঁজে না পায় ?

আমি বললাম, কেন চাইছো ?

জীবন চাচা বললেন,

ছেলেবেলায় একজন বিদেশী কবির কবিতা পড়েছিলাম । উনি বলেছিলেন, আমি এমন যায়গায় সমাধিস্থ হতে চাই যেন একটা পাথরের টুকরোও বলতে না পারে আমি কোথায় শুয়ে আছি । কেন জানি কবির কথাটা মনে গেঁথে গেছে । সে কথাটাই বার বার মনে পড়ে ।

আমি চুপ করে গেলাম । কিছু বললাম না কারণ আমারও কথাটা খুব ভাল লাগলো ।

কি চুপ হয়ে গেলি ?

আমি বললাম, ভাবছি কবির কথাটা ।

ভেবে কি পেলি ?

আমি বললাম, এত সুন্দর কথা আমি কখনো শুনিনি ।

চাচা হেসে দিলেন ।

।। ৮ ।।

পুজো

দুর্গাপুজা শুরু হয়েছে বাংলাদেশে । বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই পূজা । সরকারিভাবে অফিস বন্ধ থাকে এই দিনগুলোতে । হিন্দু ধর্মাম্বলীরা সাত দিন ধরে পুজো করে । দূর্গা পুজার বিরাট প্রভাব পড়ে পুরোনা ঢাকায় । আমাদের বাড়ির রাস্তা লাইট দিয়ে সাজানো হয় ।

আমাদের আশেপাশে হিন্দু পাড়া-পড়শীর অভাব নেই । আমরা দাওয়াত পেয়েছি । বিজয়া দশমির দিন আসল পুজোটা হবে যেদিন মা-দূর্গা ফিরে যাবেন কৈলাস পর্বতে তার স্বামীর কাছে ।
আনু-রানুকে বললাম, চল, পুজো খেয়ে আসি ?
চলো, ওরা এক কথায় রাজি ।

তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নেমেছে কিন্তু তা বোঝবার যো নেই । চারিদিকে ঢোক ঢাল বাজছে । রাস্তায় নামতেই লাল-নীল ছোট-ছোট বাতি চোখে পড়লো । সারাটা রাস্তা সাজানো হয়েছে বাতি দিয়ে ।
আনু বললো, কই যাবি বুবা ?
বাদলদের বাড়ি যাই ।
ওরা মাথা নেড়ে সায় দিল ।

বাদল আমার ছোটবেলার বন্ধু । এক সাথে স্কুলে পড়েছি । এখন নারিন্দাতে থাকে । ওর এক মেয়ে আছে, নাম শিতা । বছর দুই হবে বয়স ।
নারিন্দার শেষ মাথায় ওর বাসা । নারিন্দা পুলিশ ফাড়ির উপর দিয়ে যেতে হয় ।
বাদল বললো, আয়, ভেতরে আয় ।
আমি, আনু আর রানু ঢুকে পড়লাম ।
তোমরা সবাই ভাল ?

আনু-রানু মাথা নাড়লো ।

বাদলের বৌ এসে আনু-রানুদের সাথে গল্প শুরু করে দিল ।

আমি বললাম, কি রেধেছিস বল ? আমি ঘন ডাল আর লুচি খেতে এসেছি ।

বাদল হেসে বললো, তাই হয়েছে । তোদের বৌদি লুচি, ডাল আর খাঁটি

দুধের সন্দেশ করেছে ।

দেখতে দেখতে কাশার প্লেটে লুচি, সন্দেশ আর ঘন ডাল আনা হলো । কেবলি চুলা থেকে নামানো হয়েছে লুচিগুলো । এখনো লালচে ভাবটা রয়ে গেছে ।

বৌদি এসে বললো, নিন শুরু করুন । তোমরাও নাও, আনু-রানুর দিকে তাকিয়ে বললো ।

আমরা খেতে শুরু করেছি । কি মোলায়েম লুচি, মুখে নিতেই গলে গেল ।

বৌদি এসে বললো, ভেবেছিলাম এই পূজোয় আপনার বউকে দেখবো ।

আমি হেসে বললাম, এর পরের পূজায় মিস হবে না বৌদি ।

আর কত কাল এক কথা বলবেন ?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম । কিছু বললাম না ।

আনু রানুর দিকে তাকিয়ে বৌদি বললো, ভাইয়ের বিয়ের কি করলে?

আনু বললো, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতে কিছু হচ্ছে না । এখন শুধু বাকী আছে হাত পা বেধে বিয়ে দেয়া ।

বাদল বললো, হাত পা বাধতে দড়ি লাগলে আমাকে বোলো । বছর পাঁচেক আগে গরু পালতাম । সে দড়িগুলো এখনো আছে ।

আমরা সবাই হেসে দিলাম ।

এই বাদল ছেলেটা একটা পিকিউলিয়ার চিজ । খুদার তৈরি শতেরো লাখ মখলুকাতের মধ্যে ও একটা । একবার দাড়ি রাখে আবার কাটে, মাঝে মাঝে জিনসের প্যান্ট পড়ে ঘুরে বেরায় আবার দেখি পায়জামা- পান্জাবী পড়েছে । নারিন্দায় যে দোকান আছে, সেটা শ্বশুর করে দিয়েছে । মাঝে-সাঝে দোকানে এসে বসে আবার থেকে থেকে কৈ যেন উধাও হয় । দুই একদিন খবর নাই আবার এসে হাজির হয় । আমাদের বৌদি নেহাৎ ভদ্র বলে কোন অসুবিধেয় পড়েনি ছেলেটা ।

বাদলের যে গুণটা সবার আগে চোখে পড়ে আর তা হলো ওর নিখুত আঁকার ক্ষমতা । বাদলের শ্বশুর সাহেব শুধুমাত্র এই গুণের জন্য মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন । বাদলের শ্বশুর একজন নামকরা আর্টিস্ট, তাই বাদলকে পছন্দ করতে পিছপা হননি তিনি ।

এই বাদল ছেলেটে নিত্য যে কাজটি করে আর তা হলো বিকেলের পর হাঁটতে বেরয় । ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটে আর ভাবে ঠিক কি ধরণের স্কেচ করা যেতে পারে । হাঁটতে হাঁটতে অনেক প্লট মাথায় আসে । বাসায় এসে তড়িঘড়ি করে সে সব আঁকতে বসে ।

নারিন্দা থেকে রিকশা নিয়ে লক্ষ্মীবাজারে নামলাম অতঃপর লক্ষ্মীবাজারের সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটা দিয়েছে । কিছুদূর পর পর পুজা মন্ডপ, লোকজন ভির করে সে সব দেখছে ।

আনু বললো, দেখেছিস বুবা, অসুরের কত বড় মোচ বানিয়েছে ওরা ?
তাকিয়ে দেখলাম মা দুর্গার পদপ্রান্তে অসুর বসে আছে । ইয়া বড় মোচ ওর নাকের নিচ দিয়ে গড়িয়ে নিচে ঝুলে আছে । আমার খুব হাসি পেল অসুরের মোচ দেখে ।
রানু বললো, মা দুর্গার চোখ গুলো কি টানা টানা? ও কি খুব সুন্দরি ছিল ?
আমি বললাম, দেব-দেবীদের তো সুন্দরই হবার কথা ।
রানু আর কিছু বললো না, চুপ হয়ে গেল । আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পূজা দেখতে লাগলাম ।

বাসায় ঢুকতে না ঢুকতেই মার ফোন এলো । ফোন ধরতেই মা বললেন,
কই গিয়েছিলি তোরা ?
পূজা খেতে ।
কার বাসায় ?
বাদলের ।
কেমন আছে বাদল ? কতদিন দেখি না ছেলেটাকে ।
ভাল আছে ।
এখন কি করে ?
ঔষধের দোকান চালায় ।

ভাল, এই বলে মা চুপ হয়ে গেলেন ।

আমি বললাম, তুমি কেমন আছ?

আমি ভাল । এই শুন....

আমি বললাম, বলো ।

অনেকক্ষণ চুপ থেকে মা বললেন, আমার আনু-রানুকে দেখিস ।

আমি বললাম, হু দেখবো । তুমি কবে আসছো ?

জানি না । দেখি ।

একটু থেমে মা বললেন, আশেক আসে বাসায় ?

হু । গত সপ্তাহে এসেছিল ।

ওর সুইজারল্যান্ড যাবার কি হলো ?

যাবে যাবে করছে । ওখানে মাষ্টার্সে এ্যাডমিশন হয়েছে ।

আর আনু ?

আনু যাবে আরো কিছুদিন পরে ।

ওদের বিয়ের কি করলি ? তোর বাবার সাথে আলাপ করে বিয়ের তারিখ ঠিক কর । তোর বাবাকে না গুতালে এসব হবে না ।

আমি বললাম, আশেকের সাথে আমার কথা হয়েছে । ওর ফ্যামিলি চাচ্ছে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে ওদের বিয়ে হোক ।

মা চুপ করে গেলেন । শুধু বললেন, বিয়েটা হয়ে গেলে একটু শান্তি পেতাম ।

মা আসতে চান তার সংসারে কিন্তু দুদিন ভাল থেকে বাবার সাথে লেগে যায় । মাকে দেখি বারান্দায় বসে আছে চুপ করে ।

আনু বলে, মা কি হয়েছে ?

না, কিছু হয়নি । কাল আমি চিটাগাং যাচ্ছি, কদিন পরে ফিরবো ।

আনু কিছু বলে না । মাথা নেড়ে অন্য দিকে চলে যায় ।

বাবার সাথে মার বনিবনা হয় না কখনই । দুদিন থেকে মা চলে যান কিন্তু ওরা কেউ কখনো কারো বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করে না । ঠিক কি নিয়ে ওদের সমস্যা, তা আজো আমরা জানি না ।

আমাদের দেশে হাজার হাজার দম্পত্তি এমন আছেন, যারা ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে এক সাথে জীবন পার করেছেন । দূর থেকে মনে হবে ওরা বেশ আছে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা উল্টো । এক সাথে থেকেছে ঠিকই কিন্তু কেউ কাউকে চিনতে পারেনি ।

আমাদের মামারা মাকে খুব ভালবাসে । মার কোন সমস্যা হলে মামারা এসে হাজির হয় । মাও চলে যান ওদের সাথে তারপর মাস খানেক গেলে আবার ছুটে আসে । কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি মা সুটকেস গোছাচ্ছে ।

বাবু শুন ।

বলো ।

কাল আমি চিটাগাং যাচ্ছি ।

আমি মাথা নাড়ি, কিছু বলি না ।

আনু-রানুর দিকে খেয়াল রাখিস ।

ঠিক আছে মা । আবার কবে ফিরছো?

দেখি, এই বলে আমাদের দুঃখি মা চুপ হয়ে যান ।

আমি বললাম, মামাদের জন্য মিষ্টি নেবে?

ঠিক আছে দে । পরক্ষণেই বলে, না, এর পরের বার দিস ।

আমি মাথা নেড়ে দাঁড়িয়ে থাকি ।

।। ৯ ।।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি

সকাল দশটা বাজতেই আশেক এসে হাজির কেমিষ্ট্রি ডিপার্টমেন্টে । এসে বললো, আনু ফ্রি আছ ?

কেন বলতো?

ফ্রি আছ কিনা বল?

হু । ক্লাস নেই আজ । একটু পরে বাড়ি ফিরবো ।

তাহলে চলো আমার সাথে, আশেক চাপ দিয়ে বললো ।

কোথায় ?

চলই তো ।

আনু কিছু বললো না । আশেকের সাথে নিচে নেমে এলো ।

আশেক বললো, বাবা নূতন গাড়ি উপহার দিয়েছেন । সেটা নিয়ে বের হয়েছি ।

দেখতে দেখতে গাড়িটা মিরপুর পেরিয়ে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পথ ধরলো । দুধারে ক্ষেত-খোলা আর তারি মধ্যে দিয়ে রাস্তা ।

আশেক বললো,

ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের কেন্টিনে আজ রুই মাছ দিয়ে ভাত খাবো । গত সপ্তাহে খেয়ে গেছি । ভীষন মজা করে রাধে ওরা, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি ।

আনু হেসে দিল । কিছু বললো না ।

হাসলে যে ?

এমনি । তোমার পাগলামি দেখে হাসি পেলো তাই হাসলাম ।

আশেক বললো,

এখন হয়তো হাসছো কিন্তু যখন সত্যি সত্যি রুই মাছের ঝোল পেটে পড়বে, তখন বলবে না আসলে ভুল হতো । তখন আমাকে হাজার হাজার ধন্যবাদ দেবে ।

আনু হেসে বললো,

রুই মাছের ঝোল পেটে পড়বার আগেই তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি । তুমি যে আমাকে মনে করে এতদূর নিয়ে যাচ্ছ, সেটাই বড় কথা । তোমাকে ধন্যবাদ আশেক ।

আশেক খুশি হয়ে গেল । কিছু বললো না ।

আনু বললো, দেখেছো কৃষকেরা কেমন নিচু হয়ে ধান বুনছে ?

আশেক বললো,

ওরা আছে বলেই আমরা দুমুঠো ভাত পেটে দিতে পারি । কৃষি কাজ কিন্তু অনেক কষ্টের । সারাদিন রোদে পুড়ে ফসল ফলাতে হয় । দেখেছো ওদের ঘাড়ের দিকটা কেমন রোদে পুড়ে কালচে হয়ে আছে ।

আনু হেসে বললো, একটা ছড়া লিখবে নাকি ?

লেখা যায় । বাড়ি গিয়ে দেখি কিছু লেখা যায় কিনা ।

আনু বললো, বুবা, তোমার ছড়ার খুব প্রশংসা করে, আমারও ভাল লাগে । তুমি চাইলে আরো ভাল লিখতে পারবে ।

বুয়েট ফাইনাল হয়ে গেলে আরো সময় নিয়ে লিখবো । পরীক্ষা মাথায় নিয়ে এসব লেখা যায় না আনু । তোমার লেখা কাকচিংড়ি ছড়াটা কিন্তু দারুণ, কোথায় যেন ছাপা হয়েছে ?

দৈনিক নিশানে ।

হু মনে পড়েছে ।

তুমি বড় হয়ে কি হবে আশেক ?. ছড়াকার না ইউরোপ ফেরত ইন্জিনিয়ার ?

দুটোই ।

আনু খুশি হয়ে গেল । আনু পড়াশোনাকে ভালবাসে আর ভালবাসে প্রতিভাবাণ মানুষদের । আশেক সে জন্য আনুর কাছে এত পছন্দের ।

আমার বোনদের ধারণা, সাধারণ মানুষ হয়ে কোন লাভ নেই । একজন সাধারণ মানুষ সমাজকে কিছু দিতে পারে না পরন্ত সে সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । যদি কেউ কিছু দিতে পারে, সে হলো একজন দক্ষ মানুষ । কথায় কথায় আনু-রানুরা বিল গেটসের কথা বলে । আমি চুপি চুপি ওদের কথা শুনি । কিছু বলি না ।

আনু বললো, তোমাকে একটা কথা জিঙাসা করতে পারি ?

অবশ্যই পার ।

গত সপ্তাহে তোমার গাড়িতে এক মেয়েকে বসা দেখলাম । কে সে ?

কবে বলো তো?

গত শুক্রবার ।

আশেক একটু চিন্তা করে বললো, হু মনে পড়েছে । বাবার এক বন্ধুর মেয়ে আমাদের বাসায় এসেছিল । বাবা বললো ড্রপ দিয়ে আসতে, তাই মনে হয় দেখেছো ।

আনু কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেলো ।

আনু কথা বলছে না দেখে আশেক বললো, তুমি তো আবার কিছু ভেবে বসনি?

আনু হেসে বললো, না, এমনি জানতে চাইলাম । তুমি কিছু মনে করলে ?

কি যে বলো তুমি ? আমি খুশি হয়েছি তুমি জানতে চেয়েছো বলে । আমরা আমাদের সমস্যাগুলো নিজেদের মধ্যে ডিসকাস করে নেব, ঠিক আছে ?

আনু আবারও খুশি হয়ে গেল । বললো, তাই হবে আশেক ।

হু হু করে গাড়িটা ছুটে চলেছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির পথ ধরে । গাড়িতে শীততাপ নিয়ন্ত্রনের কঠোর ব্যবস্থায় থাকায় বাইরের উত্তাপ, আলো-হাওয়া কিছুই ওদের গায়ে লাগছে না । আশেক গাড়ি চালাচ্ছে আর অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে । আনু শুনছে আর মাঝে মাঝে উত্তর দিচ্ছে । আজকে ওর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না ।

আশেক বললো, কি হয়েছে তোমার ?. কথা বলছো না যে?

কেন জানি ভাল লাগছে না, আনু সত্যি কথাটাই বললো ।

আশেক কিছু বললো না ।

।। ১০ ।।

ঈশা

সদরঘাটে এসেছি । আমার বাড়ি থেকে হেঁটেই আসা যায় । অনেকে আবার রিকশা নিয়ে আসে । এখানে এসেছি ঈদের কেনাকাটা করতে । সাতদিন পরে ঈদ । পায়জামা-পান্জাবী কিনবো আর বাবার জন্য কাপড় । পাতলা খান লেনে পুরোনো দরজি আছে । ওর কাছে বাবার পায়জামা-পান্জাবীর মাপ দেয়া আছে । শুধু কাপড় দিয়ে বলতে হয়, খন্দকার সাহেবের কাপড় । দুদিন পরে পায়জামা-পান্জাবী বানিয়ে হাজির হয় দরজিয়ালা ।

দরজি দিয়ে বানিয়ে পড়ার দিন চলে গেছে কিন্তু আমার বাপ-চাচারা এখনো সে সব করেন । আমি রেডিমেড কিনি । সাদা পান্জাবীর উপর কালো সুতোর কাজ । খারাপ না, নিয়ে নিলাম এক সেট । আনু-রানুর জামা কেনা হয়েছে গত সপ্তাহে । ওদের জামা এদিকে পাওয়া যায় না । নিউ মার্কেট, গাউছিয়া থেকে ওরা জামা কেনে ।

কি কিনলেন?

তাকিয়ে দেখি ঈশা দাঁড়িয়ে আছে । আজ আর কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পড়েনি ও । ঘিয়া রংয়ের শাড়ি পড়েছে । মাথার চুল শক্ত করে বাধা । টানা টানা চোখে সুরমা দিয়েছে বলে মনে হলো ।

আমি বললাম, জামা-কাপড় ।

আনু-রানু কিনেছে ?

হু গত সপ্তাহে । তুমি?

আমি কিনেছি ।

কি কিনলে এবার ?

কালো পাড়ের সাদা শাড়ি ।

কালো পাড়ের সাদা শাড়ি শুনতেই আমার ভাল লাগলো । আমি খুশি হয়ে গেলাম, বললাম, ঈদের দিন এসো । তোমাকে সাদা মিষ্টি খাওয়াবো । তোমার জন্য স্পেশাল করে বানাতে বলবো কালু মিয়াকে ।

ঈশা বললো, ঠিক আছে, আসবো ।

দোকানে আসবে না বাসায় ?

বাসায় । ঈদের দিন দোকানে আসতে বলছেন কেন?

সরি । ভুল হয়েছে ঈশা ।

ঈশা একটু হেসে বললো, আনু-রানুকে ঈদের শুভেচ্ছা দেবো তারপর আপনার সাদা মিষ্টি । আপনার কোন গেস্ট আসবে সেদিন?

ঠিক নেই । আসতেও পারে আবার নাও পারে ।

তাহলে আনু-রানুকে নিয়ে বিকেলে আমাদের বাসায় আসুন । আমি চটপটি করবো ।

আমি বললাম, সারাদিন পোলাও মিষ্টি খাবার পর চটপটি দারুণ লাগবে । আসছি তাহলে ।

চাচাকে সাথে নিয়ে আসতে পারবেন ?

আমি হেসে বললাম, এই অনুরোধটা কোরো না । বাবাকে আনা যাবে না ।

ঠিক আছে । আপনারাই আসুন ।

একদিন আনু এসে বললো, দাদা আমার বিয়ে ঠিক করে গেলো আশেকের সাথে কিন্তু তোর বিয়ে কেন ঠিক করলো না ?

আমরা যে ছেলে তাই ।

ছেলেদের বিয়ে করতে নাই নাকি ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম তারপর বললাম,

মেয়েদের বিয়েটা বেশি ইমপর্টেন্ট মনে হয়েছে দাদার কাছে তাই ঠিক করে গেছে । তোর কি আশেককে অপছন্দ হয়?

আশেকের মতন ছেলে একটিও নেই বুবা । ও আসলেই ইউনিক ।

সে জন্যই তো দাদা ঠিক করে গেছেন । তারপর বললাম, আশেক কবে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড ?

মাস খানেক পরে । ওর এ্যাডমিশন হয়ে গেছে ।

আর তুই ?

আমার যেতে আরো এক বছর ।

আমি বললাম, তোদের বিয়েটা সেরা ফেলতে হয় । জীবন চাচার সাথে আলাপ করবো ।

আনু কিছু বললো না । চুপ করে রইলো ।

একটু পরে আনু বললো, তুই বিয়ে করবি না ? নাকি জীবন চাচার মতন বুড়ো হয়ে কাটাবি?

আমি হেসে বললাম, করবো ।

কাকে করবি ?

দেখি কাকে করা যায় ।

তোর পছন্দ ঈশাকে, ঠিক ?

ঈশাকে আনছিস কেন এর মধ্যে ?

ঈশাকে আনছি কারণ আমাদের বুবা ঈশাকে পছন্দ করে ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কিছু বললাম না ।

আনু বলতে লাগলো,

ঈশা এখন কত বড় হয়েছে । সব পরীক্ষায় ফাস্ট হয় । কত যে বিয়ে এসেছে ঈশার । তোর সাথে বিয়ে দেবে না ওরা । তুই যে কি ? লেখাপড়াটা করলি না । বাবার মতন ঘরে বসে রইলি ।

আমি বললাম, তুই আর রানু তো লেখাপড়া শিখেছিস । তাতেই আমার হয়ে গেছে । খেতে চল, ক্ষিদে পেয়েছে ।

আনু হাসলো । দুঃখের না সুখের বোঝা গেল না ।

।। ১১ ।।

আবারও মুন্সিগন্জ

গ্রীষ্মের ছুটি চলছে আনু-রানুদের । আমাকে এসে বললো, বুবা, মুন্সিগন্জ যাবি?

আমি সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলাম । বললাম, কবে যেতে চাস ?

কাল ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

আমরা যখন রওনা হবো, তখন বাবা এসে হাজির । বাবা এসে বললেন, আমিও যাচ্ছি তোমাদের সাথে ।

আমি বললাম, বেশ তো চলো ।

এই মুন্সিগন্জ এমন এক যায়গা, যেখানে যেতে আমরা কখনো পিছপা হই না । যখনি সুযোগ পেয়েছি, মুন্সিগন্জে গিয়ে হাজির হয়েছি তারপর গোটা দশেক দিন প্রাণ ভরে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি । আমরা গেলে জীবন চাচা খুব খুশি হন আর সেটাই আমাদের প্রধাণ কারণ মুন্সিগন্জ যাবার ।

এবার আর জীবন চাচাকে বলা হয়নি । আনু-রানুদের প্ল্যান ওরা চাচাকে সারপ্রাইজ দেবে । দুপুর পার না হতেই আমরা মুন্সিগন্জে পৌছে গেলাম । জীবন চাচা তো আমাদের দেখে অবাক । খুব খুশি হলেন চাচা । আমাদের মালামাল টেনে উপরে উঠালেন তারপর আমাদের খাওয়া- দাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেন ।

বিকেলে দেখি আনু বসে আছে জানালা ধারে । আমি গিয়ে বললাম, আশেকের কোন খোঁজ পেলি ?

হু ভাল আছে । পড়াশোনা শুরু করেছে তবে এখন সুইজারল্যান্ডে খুব ঠান্ডা । ও বাড়ি থেকে বের হয় না ঠান্ডার ভয়ে ।

আর কি লিখেছে ?

আরও লিখেছে ওর ইউনিভার্সিটি খুব সুন্দর, শিক্ষকরা আরো সুন্দর ।

আমি হেসে বললাম, এত দেশ থাকতে তোরা সুইজারল্যান্ড বেছে নিলি কেন?

আনু বলতে লাগলো,

আমাদের দুজনেরই খুব পছন্দ সুইজারল্যান্ড । আমার ঘরে তো অনেক পোষ্টার দেখেছিস সুইজারল্যান্ডের । পাহাড়ের ধার ঘেষে কাঠের বাড়ি, এ আমার কাছে রপকথা মনে হয়, বুবা ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

ছবি পাঠিয়েছে ?

না । কিছুদিন পরে পাঠাবে । আর হ্যাঁ, তোকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে । তোকে ও খুব পছন্দ করে, বুবা ।

আমি কিছু বললাম না ।

আনু অন্য কথায় গিয়ে বললো, দেখেছিস দাদার কবরের উপর কি সুন্দর ফুল ফুটেছে ?

আমি জানালা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিলাম । দেখলাম, লাল-লাল জবায় ভরে আছে গাছটা । কয়েকটা ডাল ফুলের ভারে কবরের উপর ঝুলে আছে ।

আমি খুব ছোট থাকতেই দাদা মারা যান । আমার আবছা আবছা মনে আছে দাদার চেহারা । ইয়া লম্বা এক লোক, মুখে মস্ত দাড়ি । দুইবার হজ্ব করেছে আমার দাদা । তৃতীয় বার হজ্বে যাবার আগে দাদার ইন্তেকাল হয় । দাদার ইচ্ছে অনুসারে বাড়ির উঠোনে দাদার কবর হলো । পরে আব্বা-চাচারা মার্বেল দিয়ে বাধাই করে কবর । কলকাতা থেকে মার্বেল নিয়ে আসে ওরা তারপর বাধাই-ছাদাইয়ের কাজ চলে ।

আমাদের বাবাও হজ্ব করেছে বিয়ের আগে । খন্দকার বাড়ির নিয়ম হলো হজ্ব করতে হয় ছেলেদের বিয়ের আগে, তাই বাবাকে পাঠানো হলো । হজ্ব থেকে ফিরে বাবার বিয়ে হলো । বিয়ের আগে কেন হজ্ব করতে হবে এর কারণ কেউ বলতে পারে না । জীবন চাচাকে বললে বলে, এটা বংশের ধারা । বহুকাল থেকে চলে আসছে ।

আমি বললাম, তাহলে কি আমাকেও হজ্ব করতে হবে বিয়ের আগে?

চাচা উত্তর দিলেন না । চুপ করে রইলেন ।

আমি বললাম, কথা বলছো না যে?

চাচা রেগে গিয়ে বললেন, তোর বাবাকে জিঙাসা কর । সে বলতে পারবে, এই বলে চাচা চলে গেলেন ।
আমি আর কথা বাড়ালাম না ।

আমার দাদা হজ্ব করবার পর সত্যিকারের হাজি হয়ে উঠলেন । লম্বা দাড়ি রাখতে শুরু করলেন । পায়জামা পড়তে শুরু করলেন টাকনুর উপরে । ফিটফাট, ধুব-ধুরস্ত মানুষটা আমূল বদলে গেলো ।

আমার বাবার কথা আলাদা । হজ্বের আগে বাবা যেরকম ছিলেন, এখনো তাই আছেন । হজ্বে গমন বাবাকে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি । সংসার-বিমূখ, ধর্ম-বিমূখ আমার বাবা একা একাই জীবন কাটাতে লাগলেন নিজের মতন করে ।

সেন্ট গ্রেগরী সকুল

হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট গ্রেগরী সকুলে এসেছি । পাতলা খান লেন থেকে হেঁটেই আসা যায় । রাস্তায় কোথাও না দাঁড়ালে দশ মিনিট লাগে । লক্ষ্মীবাজারের সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট গ্রেগরী হাই স্কুল । সম্ভবত ঢাকা শহরের সবচেয়ে পুরোনো স্কুলগুলোর মধ্যে একটা । মেট্রিক পর্যন্ত পড়েছি তারপর কলেজে ঢুকি । ইয়া লম্বা লম্বা বিদেশী শিক্ষক ছিল তখন । একজনের নাম ব্রাদার হোবার্ট । মুখে অল্প দাড়ি, ইয়া লম্বা । ঘাড় উঁচিয়ে কথা বলতাম আমরা । আমাদের ইংরেজি পড়াতো ব্রাদার হোবার্ট । কেউ পড়া না পাড়লে সে তার দাড়ি দিয়ে ছাত্রের মুখ ঘষে দিত । ওটাই ছিল ওর শাস্তির স্টাইল । আমি জীবনে কয়েকবার ঘষা খেয়েছি । এখন ব্রাদার হোবার্ট বেঁচে নেই । অনেক শিক্ষকই বেঁচে নেই । কেমন খাঁ খাঁ করে সকুলটা ।

সকুল কমপাউন্ডের ভেতরে বিশাল গির্জা । মাথাটা চোঙা করে বানানো, শক্ত মজবুত দেয়াল দিয়ে ঘেরা । প্রায় বিকেলে ওরা প্রার্থনা করতো । সকুলের শেষে আমি গিয়ে বসতাম গির্জায় । কি সুন্দর মিষ্টি সুরে ওরা গান গাইতো । মাঝে মাঝে আনু-রানুদের ডেকে আনতাম বাসা থেকে তারপর আমরা বসে বসে গান শুনতাম । যেমন, একবার একজন গাইলো, তোমাকে শিশু হতে হবে, তোমাকে শিশু হতে হবে ।

সকুল ছুটি হলে আশেকের বাবা আশেককে দিয়ে যেত আমাদের বাসায় । আমরা সারাদিন হই হুল্লোর করতাম । আমাদের মা আমাদের জন্য পিঠা ভাজতেন, পায়েশ বানাতেন আরো কত কি । কতদিন আশেক আমাদের বাসায় থেকে গেছে । ওর বাবা এসে টানাটানি করলেও যেত না । বাবা এসে বলতেন, আজ থাক । কাল নিয়ে যেও । আশেকের বাবা কিছু বলতো না ।

তখনো আমরা কেউ জানতাম না আশেকের সাথে আনুর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে । আনু প্রথম জানতে পারলো যখন ও ক্লাস এইটে পড়ে তারপর অনেক দিন আশেককে দেখে লজ্জায় সরে গেছে ও কিন্তু আস্তে আস্তে দূরত্ব কমে এসেছে । এখন ওরা বড় হয়েছে । নিজেদের ভবিষ্যত নিজেরাই ঠিক করে নেবে ।

তখন বেলা পড়ে আসছে । সকুলের একপ্রান্তে বসে আছি । ছেলেরা বাস্কেটবল খেলছে । আমিও খেলতাম ছেলেবেলায় । কলেজে উঠবার পর সে সব ছেড়ে দিয়েছি । এখন মিষ্টির দোকান চালাই, লাল-সাদা মিষ্টি বানাই । সকুল জীবনের একটা কথা মনে পড়লো । তখন আনু-রানুরাও সকুলে পড়ে । আমরা তিন ভাই বোন এক সাথে বের হতাম সকুলের উদ্দেশ্যে । বাবা স্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন তারপর আমার হাতে এক টাকার আধলি দিতেন । তখন এক টাকা অনেক টাকা । অনেক কিছু কেনা যেত এই এক টাকা দিয়ে । টিফিনের সময় আমি বার্গার কিনে খেতাম । আনু-রানুরা পেত আট আনা করে । বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে বেশি দিত কারণ আমি যে বড় । বড়রা বেশি পাবে এ ভাবে ভাগ করা হতো ।

আনু এসে বলতো, বুবা ।

বল ।

তুই এক টাকা দিয়ে কি করিস?

আমি বললাম, আট আনা দিয়ে বার্গার কিনি আর বাকিটা জমিয়ে রাখি মাটির ব্যাংকে ।

তাহলে তো তোর অনেক টাকা ?

আমি হেসে বললাম, হু । পন্চাশ টাকার কম না ।

আনু বললো, আমাকে দিবি ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলতাম, না ।

আনু মন খারাপ করে চলে যেত ।

মাটির ব্যাংকটা যখন ভরে যেত, তখন ভেঙে ফেলতাম । এক গাদা পয়সা হুরমুর করে বেরিয়ে আসতো । আনু-রানুরা গুনতে বসতো । গুনেটুনে বলতো সব মিলিয়ে ষাট টাকা আট আনা ।

আমি বলতাম, ঠিক আছে, এখন যা ।

ওরা তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকতো যদি আমি কিছু দেই । আমি কোন কথা বলতাম না । ওরা হতাশ হয়ে ফিরে যেত । তারপর রাত নামলে টাকাগুলো ওদের বালিশের নিচে গুজে দিতাম । ভোর হলে ওরা এসে লাফিয়ে পড়তো আমার বিছানায় । তারপর সারা বিছানাময় আমরা হুই-হুল্লোর করতাম ।

আনু বলতো, তুই খুব ভাল বুবা?

তোরাও ভাল ।

ওরা হেসে দিত তারপর টাকাগুলো দুলিয়ে দুলিয়ে ঘরে চলে যেত ।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে । আনু-রানুরা এখন কত বড় হয়েছে । এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওরা । এখন আমি আর মাটির ব্যাংকে টাকা জমাই না । আনু রানুরাও বলে না মাটির ব্যাংকে টাকা জমাতে । ওরা এখন অনেক লেখাপড়া করে । অনেক বড় হবে ওরা ।

।। ১৩ ।।

আশেকের চিঠি

হাজী শরীয়তুল্লাহ মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে কেবলি ঘরে ঢুকেছি । ঢোকার মুখে টেবিলের কোনায় বাড়ি খেলাম । টেবিলটা বহুদিন ধরে এখানে আছে । কখনো বাড়ি খাই নি, আজই প্রথম । মা বলতেন বাইরে বেরুবার পথে অথবা ঘরে ঢোকবার মুখে বাড়ি খেলে কিছুক্ষণ বসে যেতে হয় । মার কথা মতো বসে গেলাম পাসের টুলে । পাঁচ মিনিটের মতন বসে নিজের ঘরে এলাম । তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে পুরোনো ঢাকায় । মোয়াজ্জেম সাহেব আজান দেবেন মাগরিবের ।

আমার প্রথম কাজ হলো শাওয়ার করা । বাইরে থেকে এসে শাওয়ার না করলে একদম স্বস্তি পাই না । পুরোনো ঢাকার অলি-গলি এমনিতেই সরু, তার সাথে যোগ হয়েছে গরম তিক্ত হাওয়া । ঘাড়ের দুই ধার ঘামে ভিজে আছে । গোছল না করলেই না ।

শাওয়ারে ঢুকে লাইফবয় সাবান লাগাতে শুরু করেছি । এই লাইফবয় সাবানের একটা সুমিষ্ট গন্ধ আছে, গোছল থেকে বেরুবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে গন্ধটা । আমার বোনরা অবশ্য লাক্স পছন্দ করে । লাইফবয় ওরা ছুঁয়েও দেখবে না । বাবার কথা আলাদা । দাদার আমল থেকে ব্যবহার করা সাবান এখনো ছাড়তে পারেনি বাবা । বাংলাদেশে এখন আর সে সব পাওয়া যায় না । কলিকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে আনতে হয় । ডাকযোগে সাবানের পোটলা এসে হাজির হয় আমাদের বাসায় । আনু-রানুরা তো হেসে মরে যায় সাবানের পোটলা দেখে কিন্তু কেউ বাবাকে ঘাটায় না । এককী নিভৃতে এই মানুষটি তার সময় পার করে দেয় ।

শাওয়ার সেরে ঘরে এসে বসেছি । ফ্যানটা ছেড়ে দিলাম ফুল স্পীডে । পুরোনো আমলের ফ্যান অনেক আয়োজন করে চলতে শুরু করলো । আজ বৃষ্টি হলে ভাল হতো, বাইরের গুমোট-ভ্যাপসাটা কেটে যেত । ভাবতে না ভাবতেই মেঘের ঝলকানি দিয়ে উঠলো । তাকিয়ে দেখলাম দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে ।

আনু এসে দাঁড়ালো আমার পাশে । কেমন জানি আলুথালু ।

আমি বললাম, শরীর খারাপ?

না ।

মন খারাপ?

না ।

তাহলে ?

আনু কিছু বললো না । একটা চিঠি বাড়িয়ে দিল ।

কে লিখেছে ?

আশেক ।

ছোট্র একটা চিঠি । এক পাতায় শেষ । পড়তে শুরু করে দিলাম ।

প্রিয় আনু,

আশা করি ভাল আছ । পড়াশুনা শুরু করেছি রীতিমত । পড়তেই তো এসেছি সুইজারল্যান্ডে । কি সুন্দর দেশ, সবুজে সবুজে ঢাকা । পাহাড়ের খাঁজ কেটে লোকজন ঘর-বাড়ি বানিয়েছে । ছবিতে যত না সুন্দর দেখেছি, বাস্তবে এর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর । ট্রেনে চড়ে সারাটা দেশ টো টো করে ঘুরেছি । বার বার তোমাকে মিস করছিলাম । তোমাকে নিয়ে লুসানের লেক দেখতে যাব । শুধু মাত্র তোমাকে আগে দেখাবো বলে আমি দেখতে যাইনি ।

আনু একটা বিপদ হয়ে গেছে, আশা করি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে । তুমি তো জান আমার ছোট একটা বোন আছে । গত বছর হাসবেন্ডের সাথে ঝগড়া করে বাড়ি চলে আসে । ওর একটু ঘুরে বেড়ানো স্বভাব আছে । বলতে পারো বাবা-মার অনেক আদর পেয়ে বড় হয়েছে মেয়েটা । একটু হুই-হুল্লুর পছন্দ করে । এ বয়সে এক-আধটু থাকতেই পারে কিন্তু ওর হাজব্যান্ড সেটা মানতে পারেনি ।

ওকে আমরা খাতা কলমে ছাড়িয়ে এনেছি ওর স্বামীর কাছ থেকে । এখন বাবা চাইছেন ওর সাথে বাবু ভাইয়ের বিয়ে দিতে আর আমাদের বিয়েটা সেরে ফেলতে । বাবু ভাইকে বোলো আমার বোনকে নিয়ে ভাবতে হবে না । বাবা সব কিছু দিয়েই বিয়ে দেবেন । আশা করি তুমি আমাকে সাহায্য করবে যেন আমাদের বিয়েটা হতে পারে । বাবু ভাই খুব ভাল মানুষ, উনাকে বুঝিয়ে বললে দেখবে ঠিক ঠিক রাজি হয়ে গেছেন ।

তুমি আমার হয়ে কাজটা করতে পারবে না ? ভাল থেকো, তোমার আশেক ।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে পাতলা খান লেনে । আমি আর আনু বসে আছি পাশাপাশি । আনু কাঁদছে না মোটেই, এক মনে তাকিয়ে আছে বৃষ্টির দিকে । আমি উঠে গিয়ে জানালাটা চাপিয়ে এলাম । বাইরে কিছুক্ষণ পর বজ্রপাত শুরু হলো ; তার ছটা এসে পড়লো আমাদের মেঝেতে ।

আনু বললো, বুবা, আমি যাই । একটু শুয়ে থাকি গে ।

আমি চিঠিটা বাড়িয়ে দিলাম । ও নিলো না । বললো, চিঠি দিয়ে কি করবো ? তোর কাছেই রেখে দে । এই চ্যাপ্টার শেষ ।

আমি কিছু বললাম না । দেখলাম আনু চলে যাচ্ছে ।

কিছুক্ষণ পর রানু এসে হাজির ।

কি ব্যাপার চুপ হয়ে বসে আছ?

আমি বললাম, চুপ কই ? কি বলবি বল?

বৃষ্টিতে ভিজবে ?

না রে । দেখেছিস বাইরে কেমন বাজ পড়ছে ।

হু, বলে রানু চুপ হয়ে গেল ।

তাহলে একটা গল্প বলো ?

আমি হেসে বললাম, কিসের গল্প শুনবি?

যা ইচ্ছে বলো । সেই যে তুমি জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিলে, এই বলে রানু হেসে দিল তারপর বললো, তুমি অনেক চাপা মাড়তে পার বুবা ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

রানু বললো,

যখন ছোট ছিলাম, তখন চোখ কান বুজে তোমার গল্প শুনতাম । গল্পের সাথে সাথে কতবার যে হারিয়ে গেছি আফ্রিকা, এশিয়া আর মরু প্রান্তরে । গল্পগুলো মিথ্যা হলেও তুমি সাজিয়ে বলতে পারতে ।

কে বলেছে মিথ্যা ?

রানু আমার মাথার চুল ধরে ফেললো ।

আমি বললাম, ব্যথা লাগছে, এখন ছাড় । ঠিক আছে মিথ্যা ।

রানু চুল ছেড়ে বললো, আনু আপার যেন কি হয়েছে । সকাল থেকে চুপ হয়ে বসে আছে । তুমি জান কিছু ?

কি আর হবে । হয়তো এমনি মন খারাপ ।

না বুবা । আমি ওর জমানো ষ্ট্যাম্প দেখতে চাইলে ও আমাকে পুরো এ্যালবামটাই দিয়ে দিলো । বললো, আজ থেকে এ এলব্যাম তোর ।

তাই নাকি ? এই বলে আমি মাথা নাড়লাম ।

বিশ্বেস হচ্ছে না? দাড়াও তোমাকে দেখাই, এই বলে রানু চলে গেল এ্যালবাম আনতে ।

।। ১৪ ।।

মুন্সিগন্জ

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে । আজ সাতদিন ধরে বৃষ্টি, থামবার কোন লক্ষণ নেই । আমরা মুন্সিগন্জে এসেছি জীবন চাচার বাড়িতে । দু-দুটো ধর্মীয় উৎসব এক সাথে পড়াতে লম্বা ছুটি পড়েছে । আমরা সাতদিন থাকবো । বাবাও এসেছে আমাদের সাথে ।

দাদার মস্তবড় ড্রইংরুমে বসে আছি আমি, জীবন চাচা, আনু আর রানু । বাবা অন্য ঘরে কার সাথে যেন কথা বলছেন ।

জীবন চাচা বললেন, আজ খিচুরি রাধতে বলেছি আর ডালের ঘন্ট । বৃষ্টির দিন বলে এসবের আয়োজন হয়েছে ।

রানু খুশি হয়ে গেল । বললো, একটু ঝাল দিতে বলো ।

এ বাড়ির সব রান্না ঝাল দিয়েই হয় । ভাবিস না একদম । আর কে কি খাবে?

রানু বলে উঠলো, দাদা বাড়ির পায়েশ ।

ঠিক আছে । পায়েশ রাধতে বলছি ।

আনু আর বাবু, তোদের কোন অর্ডার আছে ?

আনু কিছু বললো না ।

আমি বললাম, যা আছে হয়ে যাবে ।

রানু বললো, তোমার ভয় করে না একা একা এই বিরাট বাড়িতে ?

একা কোথায় ? এ বাড়ির নিচ তলায় এখনো তিনটে পরিবার থাকে । ওরা উপরে আসে না কিন্তু ওদের হাক-ডাক কানে আসে সব সময় ।

রানু বললো, তারপরেও । আমি হলে থাকতে পারতাম না । এসব পুরোনো বাড়িতে ভুত থাকে ।

জীবন চাচা মাথা তুলে বললেন, তুই একটা লোক দেখা যে বলবে সে নিজে ভুত দেখেছে । সবাই বলে এ দেখেছে, ও দেখেছে । আসলে কেউ দেখিনি । এগুলো সব কল্পনা ।

রানু কিছু বললো না ।

আমি বললাম, এবার একটা গল্প বলো ।

কিসের গল্প শুনবি?

আমি চুপ থেকে বললাম, দাদার ?

ঠিক আছে । রাতের খাবার খেয়ে বলি ।

রানু বললো, না এখনি বল । ডিনারের সময় হতে এখনো অনেক দেরি ।

জীবন চাচা বলতে লাগলেন,

তোদের দাদা ছিলেন বেপড়োয়া ধরনের । একাই চলে যেতেন জঙলে । সাথে নিতেন মস্ত লাঠি । সারাদিন জঙল চষে সন্ধ্যের আগে ফিরে আসতেন । তখন আমরা বাবাকে ঘিরে বসতাম জঙলের গল্প শুনতে । তোদের দাদা সারাদিন যা যা দেখেছ, সে সব বলতো । আমরা হা করে শুনতাম । তারপর হয়তো ঠিক করলো মাছের চাষ করবে । সাথে সাথে পুকুর খোড়া হলো । ছোট ছোট পোনা ছাড়া হলো সারা পুকুরে । সে পুকুর এখনো আছে । সেই পুকুর থেকে তোদের দাদা অনেক টাকা আয় করেছে ।

আমি বললাম, দাদার পরে তোমরা কেন চাষ করলে না?

জীবন চাচা চুপ হয়ে গেলেন । তারপর বললেন, চাষ করলে খারাপ হতো না । তুই চাইলে শুরু করতে পারিস ।

সাথে সাথে রানু বললো, বুবা করবে না । আমাকে পার্টনার নাও । আমি ঠিক ঠিক দাঁড় করিয়ে দেবো ।

রানু সত্যি কথাটাই বললো । ও চাইলে অনেক কিছু করতে পারবে । মা'র সব স্বভাব পেয়েছে আমার দুই-বোন যেমন পরিশ্রমী তেমনি Ambitous । আমাদের মাও অনেক কিছু করতে চেয়েছেন কিন্তু বাবার কারণে সে সব হয়নি ।

সন্ধ্যের পর বৃষ্টিটা কমে এলো । ঝিঝি ডাকতে শুরু করেছে সন্ধ্যের পর থেকে । অনবরত বৃষ্টির কারণে ঠান্ডা পড়ে গেল । আমরা হালকা সোয়েটার গায়ে বসে আছি দাদার ড্রইংরুমে । একটু পড়েই ডিনারের ডাক পড়বে ।

আনু এসে বললো,

ঈশার বিয়ে সামনের মাসে । ছেলে ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, আমেরিকায় থাকে । ফোনে বিয়ে পড়ানো হবে ।

আমি বললাম, তাহলে বিয়েটা খাওয়া হচ্ছে না । ভেবেছিলাম ঈশার বিয়েটা আরাম করে খাব ।

আনু রেগে গেল কিন্তু কিছু বললো না ।

আমি বললাম, কি হলো তোর ?

তুই একটা বোকা ।

আমি কিছু বললাম না ।

কিছুক্ষণ পরে আনু বললো, তু একা না । আমিও একটা গাধা আর তাই আমাদের দুজনের অনেক মিল ।

আমি বললাম, সুইজারল্যান্ড থেকে আশেক আর কোন চিঠি দিয়েছে ?

না ।

ওর খবর কি?

জানি না বুবা তবে কে যেন বললো ওর নাকি বিয়ে । বিয়ে করতে দেশে আসছে ।

আমি কিছু বললাম না ।

একটু থেমে আনু বললো,

আমার সুইজারল্যান্ডে স্কলারশীপটা হয়ে গেছে মাস্টার্স প্রোগামে । জুনের সেশন ধরতে হবে ।

আমি বললাম, তাহলে তো আর তিন মাস ?

হু, বলে আনু মাথা নিচু করে আনলো । কিছু বললো না ।

মস্ত বড় হল-ঘরটাতে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে । দাদার আমলে কেনা খাটটা নজরে পড়লো সবার আগে । হাজারো কারুকাজে ভরা খাট, দু-তিনজন অনায়েসে শুতে পারবে । আনু-রানুদের অন্য ঘরে শোবার ব্যবস্থা হয়েছে । বাবা নিচের তলায় শোবে তার চির-পরিচিত ঘরে । জীবন চাচা আমার পাশের ঘরে ।

চাচা এসে বললেন, সব ঠিক আছে তো ?

আমি মাথা নাড়লাম ।

চাচা বললেন, রাত অনেক হলো । শুয়ে পড় ।

ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত নয়টা । এই আধো গ্রাম, আধো শহরের জন্য রাত নয়টা অনেকখানি ।

আমি বললাম, তুমি কখন ঘুমাও চাচা?

দশটার মধ্যে শুয়ে যাই তবে কেউ এলে গল্প-সল্প করি । ঘুমুতে ঘুমুতে রাত হয়ে যায় ।

আমি কিছু বললাম না ।

জীবন চাচা বলতে লাগলেন, আনুটাকে নিয়ে কি করি বলতো ?

আমি বললাম, কি করতে চাও?

চাচা বলতে লাগলেন,

আশেকের বাবার সাথে কথা বলতে গিয়েছিলাম । ঐ লোক এমন এক ভাব করলো যেন আনু-আশেকের বিয়ে নিয়ে তেমন কোন কথা হয়নি । আশেকের বাবা বললেন, খুদা চাহে তো বিয়ে হবে, এ নিয়ে আমাদের দৌড় ঝাপ পেড়ে কি লাভ বলুন ?

আমি সাথে সাথে বললাম, তুমি কি বললে?

কি আর বলবো ? জোড় করে তো বিয়ে দেয়া যায় না । একটা বিষয় পরিষ্কার হলো, বিয়েটা না হলে ওরা খুব বেঁচে যায় । জোড় করে বিয়ে দিয়ে আমাদের আনু কি সুখি হবে?

একটু থেমে চাচা বললেন,

মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল রে । মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল । দেখিস আনু আর বিয়ে করবে না ।

।। ১৫ ।।

অনেক দিন পর

বাবু ভাই ।

তাকিয়ে দেখি ঈশা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে । ওর সাথে ছোট্ট একটা মেয়ে । তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে । কাষ্টমার খুব একটা নেই । ওকে নিয়ে আমার ছোট্ট অফিস রুমে এলাম । দোকানের পেছনে অফিস ঘর ।

কবে এলে আমেরিকা থেকে?

গত সপ্তাহে । ভাবলাম পাতলা খান লেন একটু ঘুরে দেখি । মেয়েকে নিয়ে বেরিয়েছি । আমার মেয়ে নিশা, এই বলে নিশাকে দেখিয়ে দিল ঈশা ।

আমি বললাম, কত বয়স হলো ওর?

দুই বছর ।

তাই নাকি ? এই বলে মাথা নাড়লাম তারপর বললাম, দেখেছো কেমন সময় চলে যায় ?

ছোট্ট একটা মেয়ে । চুলগুলো কোকড়ানো, একেবারে ঈশা । গালে টোল পড়ে আছে ।

আমি বললাম, সকুলে ভর্তি করেছো ?

না । এবার আমেরিকা গিয়ে ভর্তি করিয়ে দেব ।

মেয়েকে কি পড়াবে ?

ওর বাবার ইচ্ছে প্রফেসারি করুক । মাষ্টার হোক ইউনিভার্সিটিতে ।

তোমার কি ইচ্ছে ?

আমার কোন ইচ্ছে নেই । নিশা যা চাইবে তাই হবে ।

আমি একটু থেমে বললাম, তোমার ফেবারেট সাদা মিষ্টি খাবে ?

ঈশা হেসে দিল । একটু মোটা হয়েছে মনে হয় কিন্তু আর সব কিছু আগের মতন আছে । হালকা গোলাপী কপাল আরো গোলাপী হয়েছে আমেরিকার আলো হাওয়াতে ।

ঠিক আছে দিন । আপনার সাদা মিষ্টি অনেক দিন খাই না ।

আমি উঠে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এলাম তারপর বললাম,

তো কেমন দেখছো পাতলা খান লেন?

আগের মতনি তবে লোকজন একটু বেড়েছে । ক্লাব ঘরটাতে মস্ত বড় সাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে । এবার তো মোয়াজ্জেম সাহেবের আজান শুনলাম না?

আমি বললাম, উনি চলে গেছেন দেশে । নূতন মোয়াজ্জেম এসেছে ।

তাই ? ছোটবেলায় উনার কাছে কায়দা-আমপাড়া পড়েছি । উনার ঠিকানা কি আছে ?

আমি বললাম, তুমি চাইলে যোগার করতে পারবো ।

ঠিক আছে একটু দিবেন ।

আমি মাথা নাড়লাম ।

ঈশা বললো, চাচা, আনু-রানু কেমন আছে ?

আনু এখন সুইজারল্যান্ডে । লুসান ইউনিভার্সিটিতে মাষ্টার্স করতে গেছে আর রানু তো ইউনিভার্সিটিতে । তুমি চিনবে না এখন রানুকে । লম্বা ধারি হয়েছে ।

ঈশা বললো,

আনু-রানুর মাথা খুব ভাল । ওরা অনেক বড় হবে দেখবেন । ওদের বিয়ে আমি দেব, আমার কাছে অনেক ছেলে আছে ।

আমি হেসে বললাম, তাহলে তো আমার কোন ভাবনা নেই । কবে বিয়ে দিচ্ছ ওদের ?

আপনি আনুর ঠিকানাটা দিন । আমি ওর সাথে যোগাযোগ করে সব ঠিক করবো ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

ঈশা একটু থেমে বললো, আপনি বিয়ে করেননি?

এই তো করবো ।

আপনার বিয়ে আর হচ্ছে না । কেউ জোড় করে বিয়ে না দিলে এ জন্মে ঘটছে না ব্যাপারটা ।

আমি আবারও হেসে দিলাম ।

ঈশা বললো, আসলে বোনদের একটা গতি না করিয়ে আপনি বিয়ে করবেন না, ঠিক ?

আমি হেসে বললাম, তুমি কিন্তু আগের মতনি আছে । একদম বদলাওনি?

আপনিও তো বদলাননি, সেই একি জামা গত চার বছর ধরে পড়ছেন ।

কিভাবে বুঝলে ?

আপনার এই জামা একবার যে দেখবে, সে কখনো ভুলবে ? সাদা কাপড়ের উপর লাল লাল ছোপ, ইয়া লম্বা কলার । আজকাল কি এসব কেউ পড়ে?

আমি হেসে বললাম, এই আমি পড়েছি ।

আপনি বলেই পড়েন । যাই হোক, আপনি যে কথা দিয়েছিলেন মাষ্টার ডিগ্রীটা করবেন, সেটার কি হলো ?

আমি হেসে দিয়ে মাথা নিচু করে ফেললাম ।

ঈশা বললো, এর মানে ঘটনাটা ঘটেনি ?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম । তারপর বললাম, তোমাকে আরও একটা মিষ্টি দেই ?

ঠিক আছে । আপনার সাথে ঝগড়া করি আর মিষ্টি খাই ।

আমি বললাম, সেই ভাল । তুমি আমেরিকাতে কিছু করছো?

হু । ওখানে গিয়ে MS টা করে শেষ করেছি তারপর মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ঢুকেছি রিসার্স অফিসার হিসেবে । বেতন ভাল । আপনাদের জামাই আমাকে এক টাকাও খরচ করতে দেয় না । সব টাকা ব্যংকে জমে ।

আমি বললাম, তুমি ভাগ্যবান ঈশা । পাড়ায় মেয়েদের অনেক উপকার করেছো । খুদাই তোমাকে সব দিয়েছেন ।

ঈশা হেসে দিল । খুশির হাসি ।

আমি বললাম, এবার কদিন থাকবে ?

বেশি দিন না, সপ্তাহ দুই । মা কে নিতে এসেছি ।

তাহলে চাচী চলে যাচ্ছেন?

হু । আমার বাসায় নিয়ে রাখবো ।

আমি বললাম, আর আসবে না দেশে?

আসবো । নিশ্চয় আসবো । এই পাতলা খান লেনে আমার জীবন কেটেছে । মাঝে মাঝে মনে পড়ে সে কথা ।

আমি বললাম, পাড়ার যে সব গৃহীনিদের তুমি ভর্তি করে দিয়েছিলে, তাদের কি অবস্থা ?

কেউ কেউ পড়া শেষ করেছে আবার অনেকে আগের যায়গায় ফিরে গেছে ।

আমি কিছু বললাম না ।

ঈশা বললো,

আমার আর আমার মেয়ের জন্য দোয়া করবেন । আমি পনের তারিখে ফিরে যাচ্ছি আমেরিকাতে । যাবার আগে রানুর সাথে দেখা করে যাব । আজ উঠি ।

আবার এসো ঈশা । খুশি হয়েছি তুমি এসেছো ।

ঈশা হেসে দিল ।

আমার বিয়ের জন্য যে চেষ্টা হয়নি তা নয় । আব্বা-চাচারা চেষ্টা করেছেন কয়েক দফা কিন্তু ওদের নজর অনেক উপরে । উপরের বংশ ছাড়া ওরা আত্মীয়তা করবে না । একবার জীবন চাচা জায়েদার বাড়িতে গেল আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে । এখন জায়দারদের অবস্থা অনেক ভালো । ওদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করেছে, ঢাকায় ওদের অনেক বড় বড় ব্যবসা । জীবন চাচার প্রস্তাবে ওরা না বললো না কিন্তু পরে লোকমারফত জানা গেল ওরা বলেছে কোন মিষ্টিয়ালার সাথে আমরা মেয়ে বিয়ে দেব না ।

।। ১৬ ।।

আবারও ঈশা

ঈশা কথা রেখেছে । কিছুদিন পরেই ঈশার ফোন পেলাম ।

হ্যালো .....বাবু ভাই ।

বলো ।

আমার পরিচিত ভাল একটা ছেলে আছে । আমেরিকাতে চাকরি করে । তোমরা যদি রাজি থাকো তো রানুর সাথে বিয়ে দিতে পারি ।

আমি বললাম, আনু?

আনুর সাথে কথা বলেছি ফোনে । ও এখন বিয়ে করবে না ।

আমি চুপ করে গেলাম ।

কথা বলছো না যে?

আমি বললাম, ঠিক আছে । আমি রানুর সাথে কথা বলে দেখি ।

ঈশা বললো, ছেলের Biodata আর ছবি পাঠাচ্ছি । সাত দিনের মধ্যে পেয়ে যাবে ।

তোমাকে ধন্যবাদ ঈশা ।

কিছুদিন যেতে না যেতেই পাত্রর ছবি আর Biodata এসে হাজির ।

এই রানু শুন ।

বলো ।

চল.....আজকে ডিনার করবো টাইটিং রেষ্টুরেন্টে ।

তাই নাকি..... চলো কিন্তু ব্যাপার কি?

না এমনি । কতদিন বাইরে খাই না ।

বুড়িগঙা নদীর ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে টাইটিং রেষ্টুরেন্ট । এ বছরি চালু করেছে ওরা । ছোট-খাট ছিমছাম, কাঠ দিয়ে বানানো । বুড়িগঙার আলো-হাওয়া এসে পড়ে রেষ্টুরেন্টে । আমাদের পাতলা খান থেকে খুব কাছে । পনের মিনিট লাগে রিকশা নিয়ে গেলে ।

রানুর পছন্দ ফ্রাইড রাইস, চিকেন আর নুডলস । সব কিছু সাজিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল । আমরা খেতে শুরু করেছি । প্লেটে-চামুচে বাড়ি খেয়ে টুং-টাং শব্দ হতে লাগলো ।

আমি বললাম, রানু বিয়ে করবি?

কি যে বলো তুমি ? আমি তো কেবল অনার্স দিলাম । এখনো তো পড়া শেষ হয়নি ।

আমি বললাম, ঠিক বলেছিস ।

কেন ? এ প্রশ্ন করছো কেন ? রানু মাথা ঝুঁকিয়ে জানতে চাইলো ।

আমি হেসে বললাম,

ঈশা বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে । ছেলে আমেরিকায় চাকরি করে । অনেকদিন হলো ঈশাদের সাথে পরিচয় ।

তাই বুঝি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো এসব বলতে?

আমি কিছু বললাম না । চুপ করে রইলাম ।

কিছুক্ষণ পরে রানু বললো, ধ্যাৎ তুমি আমার খাবার মুডটাই নষ্ট করে দিলে । ভাবলাম একটু আরাম করে চাইনিজ খাবো ।

আমি বললাম, তোকে বিয়ে করতে হবে না । এমনি এমনি বলেছি, নে শুরু কর ।

একটু পরে রানু বললো, বুবা.....

বল ।

ছেলে কি পড়েছে ?

আমি জানি আনু-রানুরা ছেলের পড়াশোনার খবর সবার আগে জানতে চাইবে । আমি বললাম, ছেলে ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্জিনিয়ার, আমেরিকা থেকে পাশ করেছে । বড় কোম্পানীতে চাকরি করে । এই দেখ ছেলের ছবি, এই বলে ছবিটা মেলে ধরলাম ।

রানু ছবিটা তুলে নিল । শুকনো পাতলা ছেলে, মাথার চুল কোকড়ানো । প্রসস্থ অধর, সারা মুখে বুদ্ধির ছাপ ।

আমি বললাম, ছেলে বলেছে মেয়ে চাইলে বাকি পড়াশোনা আমেরিকায় পড়তে পারবে ।

রানু মাথা নিচু করে খেতে লাগলো আর আড় চোখে ছবির দিকে তাকাতে লাগলো যেন আমি না দেখে ফেলি ।

কিছুক্ষণ পরে বললো, আব্বা, মা, জীবন চাচা কি বলেন?

ওরা রাজি তবে তোর ইচ্ছে না হলে বিয়ে হবে না । আমি ঈশা কে বলে দেব ।

রানু কিছু বললো না । চুপ করে রইলো ।

।। ১৭ ।।

রানু

ঘুম থেকে উঠে দেখি রানু বসে আছে আমার টেবিলে । সাধারণত এতো সকালে আনু-রানুরা আমার ঘরে আসে না । আমি বললাম, কিরে ? এতো সকালে, কিছু বলবি ?

না এমনি ।

ঠিক আছে বোস । আমি শাওয়ার সেরে আসি ।

ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজ হলো শাওয়ার করা । লাইফবয় সাবান দিয়ে অনেকক্ষণ শাওয়ার করি তারপর নামাজ পরে অন্য কাজে মন দেই ।

শাওয়ার করে বেরিয়ে দেখি রানু তখনো বসে আছে । কি যেন হাবিজাবি আঁকছে ।

আমি কাছে গিয়ে বললাম, কি আঁকছিস ?

না কিছু না, এই বলে রানু উঠে গেল । আবার ফিরে এলো কিছুক্ষণ পরে ।

আমি আমার বোনদের চিনি । কোন সমস্যা হলে ওরা আমার চারিপাশে ঘুর ঘুর করে । এ আমার কাছে নূতন না ।

আমি রানুর কাছে গিয়ে বললাম, তোর ছেলে পছন্দ হয়েছে?

রানু মাথা নিচু করে রইলো । উত্তর দিল না ।

আমি বললাম, ঠিক আছে । আমি ঈশাকে বলছি ।

রানু কিছু বললো না । মাথা নিচু করে রইলো ।

আমি আনুকে ফোন দিলাম ।

কেমন আছিস ?

ভাল ।

তুই?

আমিও ভাল । তারপর একটু থেমে বললাম, ঈশা তোকে ফোন দিয়েছিল ?

হু ।

কি বলে ?

বিয়ের কথা বলে ।

আমি বললাম, বিয়ে করবি না?

এখন না বুবা । আমাকে সময় দে ।

ঠিক আছে । তোর যখন ইচ্ছে হবে বিয়ে করিস ।

আনু বললো, রানুর জন্য ঈশা যে ছেলেটা দেখেছে, ওর সাথে রানুর বিয়ে দিয়ে দে ।

সত্যি বলছিস?

হু, জোড় দিয়ে বললো আনু কথাটা ।

।। ১৮ ।।

রানুর বিয়ে

আজ রানুর বিয়ে । ছেলে এসেছে এক মাসের ছুটি নিয়ে । ছবির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে । হালকা পাতলা ছেলে, হেসে হেসে কথা বলে ।

বিয়ে উপলক্ষে আমাদের মা এসে হাজির । এবার সাতদিন থাকবে আমাদের মা । বহুদিন পর বাবা-মা কে হাসতে দেখলাম । মাকে দেখলাম বাবার জামা ইস্ত্রি করছে ।

জীবন চাচা সেই সকাল থেকে দৌড়াদুড়ি করছেন । পাশেই কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া নেয়া হয়েছে । কাজি-মুসা কমিউনিটি সেন্টার । নন্দলাল দত্ত লেনের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কমিউনিটি সেন্টার ।

আমাদের বাড়ির প্রথম বিয়ে বলে বাবা সবাইকে দাওয়াত দিয়েছে । প্রায় ছয়শো লোকের আয়োজন । ঢাক-ঢোল শানাই বাজতে লাগলো দুপুরের পর থেকে । মাগরিবের পরে বিয়ে পড়ানো হবে ।

বিয়ের সাত দিন আগে আনুকে ফোন দিলাম ।
বুবা.... বল ।
রানুর বিয়ে সামনের সপ্তাহে, চলে আয় ।
না রে বুবা । আমি আসতে পারছি না ।
কেন ?
আনু কোন উত্তর দিল না ।
কথা বলছিস না কেন?
এমনি । তারপর একটু থেমে বললো, বিয়ের সব ছবি আমাকে পাঠাস । আমি দেখবো ।
আমি বললাম, ঠিক আছে । বিয়ের দিন তোকে আবার ফোন দেবো । ভাল থাকিস ।

কদিন পরে রানুও ফোন করলো আনুকে । আনুর একি কথা, ও আসতে পারছে না । রানু কিছু বললো না, মন খারাপ করে বসে রইলো ।

আনুকে ছাড়াই রানুর বিয়ে হয়ে গেল । বিয়ের পর দিন ওরা বেড়াতে এলো । রানু কি খুশি । ছেলেটাও খুব ভদ্র । রানুর খুশি দেখে আমাদের মন ভরে এলো । মা বললেন, আমি আরো সাত দিন থাকবো ।

নূতন জামাই ঘরে এসেছে, দুদিন থাকবে । মা রান্না করতে বসলেন । আমাকে বললেন, বাবু কিছু জিনিষ যে লাগবে?
আমি বললাম, বলো ।
মা একটা লিষ্ট করলেন । লিষ্টের প্রথমে আছে কাল জিরার চাল তারপর ঘিয়ের কোওটা, গরুর মাংশ, কিসমিস ইত্যাদি ।
জীবন চাচা এসে বললেন, চল, একসাথে বাজারে যাই ।

জীবন চাচা বাজারে যাবেন শুনে একটু অবাক হলাম । এ পথে আব্বা- চাচারা কখনো মাড়ায় না । বাড়ির কাজের লোকেরা এসব সারে । রানুর বিয়ের খুশিতে জীবন চাচা ভুলে গেছেন উনাদের জমিদারির কথা । চাচার এই দিবাস্বপ্ন ভাঙার আগেই চাচাকে নিয়ে বাজারে রওনা হলাম ।

।। ১৯ ।।

আনুর চিঠি

প্রিয় বুবা,

কেমন আছিস ? গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে সুইজারল্যান্ডে । এখন দীর্ঘ অবসর তাই লম্বা চিঠি পাঠালাম । আজ সকাল থেকেই বরফ পড়ছে লুসান শহরে । লুসানের রাস্তা-ঘাট, রেলওয়ে সব চাপা পড়ে আছে বরফের নিচে । মনে হয় লুসান শহর তার সব কষ্ট চাপা দিয়ে হেসে উঠছে থেকে থেকে ।

আশেক এখন জেনেভা থাকে । ওখানকার এক কোম্পানিতে জয়েন করেছে । আমার এখান থেকে ট্রেনে যাওয়া যায় । কিছুদিন আগে জানতে পারলাম ওর একটা মেয়ে হয়েছে । ওদের একটা ছবিও দেখলাম এক বাঙালী পরিবারের কাছে । আশেক অনেক মোটা হয়েছে ; শরীরে অলসতা এসেছে, ছেলেরা বাপ হলে যা হয় । ওর বউ খুব সুন্দরী, মস্ত বড় খোপা করে ছবি তুলেছে স্বামীর পাশে । এই মেয়েকে আমি আশেকের সাথে কয়েকবার দেখেছি ঢাকার রাস্তায় । তুই তো আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলি । এখন নিশ্চয় বলবি না আমি ভুল দেখেছিলাম ।

রানুর খবর কি? রানুর বিয়ের সব ছবি দেখলাম । ওকে খুব সুন্দর লাগছিল বিয়ের শাড়িতে । রানুর বরটাও সুন্দর । রানু যে রকম ছেলে চেয়েছিল, ঠিক তাই হয়েছে । রানুকে আমার অনেক অনেক আদর দিস ।

বুবা, তোর তো এখনো বিয়ে করা হলো না । আমাদের দুই বোনকে বড় করতে গিয়ে তুই একাই রয়ে গেলি । এবার নিজের সংসার শুরু কর, ঘরে বৌ নিয়ে আয় । সেই ঘর বাড়ি গুছিয়ে রাখবে ।

পাতলা খান লেনের বাড়িতে আমার ঘরে একটা স্যুটকেস দেখবি । সেটা খুলে একটা টিনের কৌটা পাবি । ওই কোটায় দশটা চুড়ি আছে, নিরেট খাঁটি সোনা দিয়ে বানানো । বাপের বাড়ি যাবার আগে মা আমাকে দিয়ে গেছেন । দাদা কলিকাতা থেকে এনেছিলেন বাবা-মার বিয়ের জন্য । সেই যে মা রেখে গেছেন, আমার কখনো পড়া হয়নি । এর অর্ধেক তোর বউকে আর বাকীটা রানুকে দিলাম । তোদের বিয়েতে আমার উপহার ।

মাঝে মাঝে বাবা-মার উপর খুব রাগ হয় । তখন হোস্টেলের বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ কাঁদি তারপর গিয়ে পড়তে বসি । ওরা দুজনেই চাপা স্বভাবের তাই ওদের সমস্যা আমাদের জানা হলো না । ব্রোকেন ফ্যামিলির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হয় না কিন্তু আমরা পেরেছি । এর কৃতিত্ব আমি তোকে দিলাম, বুবা ।

আমি আর বেশিদিন নেই সুইজারল্যান্ডে । সেমিস্টারের রেজাল্ট বেরুলো চলে যাব কানাডাতে । ওখানে একটা কাজ জুটেছে । যে টাকা দেবে, তা দিয়ে বেশ চলে যাবে আমার ।

এখন শুধু জীবনের হিসেব মেলাবার চেষ্টা করি । আসলে জীবন আমাকে ঠকায়নি, আমি জীবনকে ঠকিয়েছি । আমরা যে আশেকদের চেয়ে শিক্ষা, সন্মান আর আভিজাত্যে অনেক পিছিয়ে গেছি, সে সত্যিকে আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল । আমার বাবা যেমন এখনো নিজেকে জমিদার ভাবেন, আমিও ভাবতাম আশেক আমার সারাজীবনের । বোকা মানুষেরা বেশি কষ্ট পায়, বুবা ।

আর কি লিখবো ? মাঝে মাঝে জীবন চাচার কথা মনে পড়ে । এই মানুষটা সারা জীবন একাই রয়ে গেল । আমাদের বাবার সাথে জীবন চাচার পার্থক্য হলো আমাদের বাবা ঘর-সংসার থাকবার পরেও একা আর জীবন চাচা তো একাই । আসলে ওরা একি বৃত্তের মানুষ । চাচাকে আমার সালাম দিস ।

খুদা হাফেজ
আনু

www.sayedhossain.com

।। ২০ ।।

আবারও আমরা

শীত পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে । পাতলা খান লেনের রাস্তায় এক প্রস্থ কুয়াশা পড়ে আছে । যতই রাত বাড়তে থাকে, শিশিরের শব্দ ততই বেড়ে চলে । রাতভর শিশির পড়ে, সেই শিশিরে ভিজে উঠে পাতলা খান লেনের রাস্তা, লাইটপোস্ট আর ডাস্টবিনগুলো ।

ঘুম আসছে না । দাদার ঘড়িতে রাত একটার ঘন্টি দিল । রাস্তায় লোক চলাচল নেই, দুই একটা রিকশার শব্দ কানে এলো । শীতের রাত বলে সবাই দরজা আটকিয়ে শুয়ে পড়েছে । আমিও শুই শুই করছি কিন্তু ঘুম আসছে না মোটেই । ঘুম না আসাটা নূতন কিছু না আমার জীবনে ।

বিছানা থেকে নেমে জানালা খুলে দাড়ালাম । লাইটপোষ্টের আলো এসে পড়লো আমার ঘরের মেঝেতে । তখন ঘরের বাতি নিবিয়ে আবার এসে দাঁড়ালাম জানালার পাশে । সামনেই ক্লাব ঘর । ক্লাব ঘরের সাইনবোর্ডে আলো থাকাতে স্পষ্ট পড়া গেল : পাতলা খান লেন ইয়ং ক্লাব ।

এখন ক্লাব ঘর অনেক বড় হয়েছে । ক্লাব ঘরের সাথে দু-তিনটে রুম ভাড়া নিয়েছে ওরা । ফুটবল খেলার পাশাপাশি ওরা জুডো কারাত শেখায় । এখন শুনছি পুরোনা ঢাকার টোকাইদের নিয়ে স্কুল খুলবে ওরা । বেশ কয়েকজন ছাত্র যোগাড় হয়েছে এরি মধ্যে । সামনের মাস থেকে সকুল বসবে ।

ক্লাব ঘরের বারান্দায় দুইজন ছিন্নমুল মানুষকে শুয়ে থাকতে দেখলাম । কাথা মুড়ে শুয়ে আছে ওরা । শিশির পড়ছে পুরোনো শহর জুড়ে ।

গত সপ্তাহে রানুর টেলিফোন পেলাম । মা হতে চলেছে রানু । আমাকে বলতে খুব ইতস্তত করছিল, ওর হাসব্যান্ড বললো সে কথা । ওরা খুব খুশি । আমাকে ফোন করে বার বার যেতে বললো । আমি বললাম, দেখি একবার যাবো । রানু বললো, না এখনি আসতে হবে । আব্বা-আম্মাকে সাথে নিয়ে আস । আমি তোমাদের টিকেট পাঠাচ্ছি ।

আনু এখন কানাডাতে । আবার পড়াশোনা শুরু করেছে ও । ছোট্ট দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়েছে । এক এ্যারাবিয়ান মেয়ের সাথে শেয়ার করে থাকে । আনুর ইউনিভার্সিটি থেকে নায়গ্রা-ফল ঘন্টা খানেকের পথ, মাঝে সাঝে গিয়ে বসে নায়গ্রার পাশে । নায়াগ্রা-ফল নিয়ে বিরাট একটা চিঠি পাঠিয়েছে আনু, সাথে কয়েকটা ছবি । অনেক শুকিয়ে গেছে মেয়েটা ।

বাবা এখনো আছে বাবার ঘরে । একা-একাই সময় কাটায় । রাত নামলে হাঁটতে বেরোয় তারপর ফিরে আসে ঘন্টা খানেক পরে । হাত পা মুছে নিজের ঘরে ঢোকে । আমার সাথে মাঝে মাঝে কথা হয় । একদিন এসে বললো,

বাবু ।

বলো ।

রানু বলছিল টেক্সাসে গিয়ে ঘুরে আসতে । তুই কি বলিস?

আমি হেসে বললাম, বেশ তো । মা কে নিয়ে ঘুরে আস ।

মার কথা বলতেই বাবা চুপ হয়ে গেলেন ।

একটু থেমে বললেন, ঠিক আছে দেখি । তোর শরীর ভাল তো ?

হ্যাঁ ভাল ।

থাক তাহলে, এই বলে বাবা নিজের ঘরে চলে গেলেন ।

।। ২১ ।।

এপারে দিগন্ত ওপারে অথৈ

মাঝে মাঝে খুব একাকী লাগে । আগে আনু-রানুরা ছিল কথা বলতে পারতাম, এখন সে রকম কেউ নেই । তখন হাঁটতে হাঁটতে বুড়িগঙা পাড়ে এসে বসি । সূর্য ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, অন্ধকার হয়ে আসছে চারিপাশ । মিট-মিট করে তারকারা জ্বলতে শুরু করেছে আকাশের নীলিমায় । দুরে ঐ দুরে 'দুর দুর' শব্দে একটা লন্চ এগিয়ে চলেছে । তখন আনু-রানুদের কথা মনে পড়ে । রানুরা বিরাট বাড়ি কিনেছে টেক্সাসে । শক্ত মজবুত ইটের বাধন দিয়ে মোড়ানো দোতলা বাড়ি । যায়গায় যায়গায় খাঁজ করে কাটা । বাড়ির ছাদটা চোঙা করে বানানো । রানু ছবি পাঠিয়েছে । বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও । হাসিতে হাসিতে ভরে আছে ওর সব কিছু ।

আনুর চিঠি আসে না অনেক দিন । গত সপ্তাহে পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়েছি । না কোন চিঠি নেই । হয়তোবা সবার সাথে অভিমান করে মেয়েটা আর চিঠি লেখে না । হয়তোবা নায়গ্রা-প্রপাতের পাড়ে বসে থাকে মেয়েটা মাথা নিচু করে । কেউবা তাকিয়ে দেখে, কেউবা হেঁটে যায় সামনে দিয়ে । আনু ঠায় বসে থাকে । ওকে যে সান্তনা দেবার কেউ নেই ।

শেষ

Please email me with comments: sayed.hossain@yahoo.com
Visit my personal domain: www.sayedhossain.com
ISBN No. 978-983-43934-8-9

April 2, 2009